সবুজ পাথর

অনীশ দেব



প্রথম প্রকাশ

আনন্দমেলা

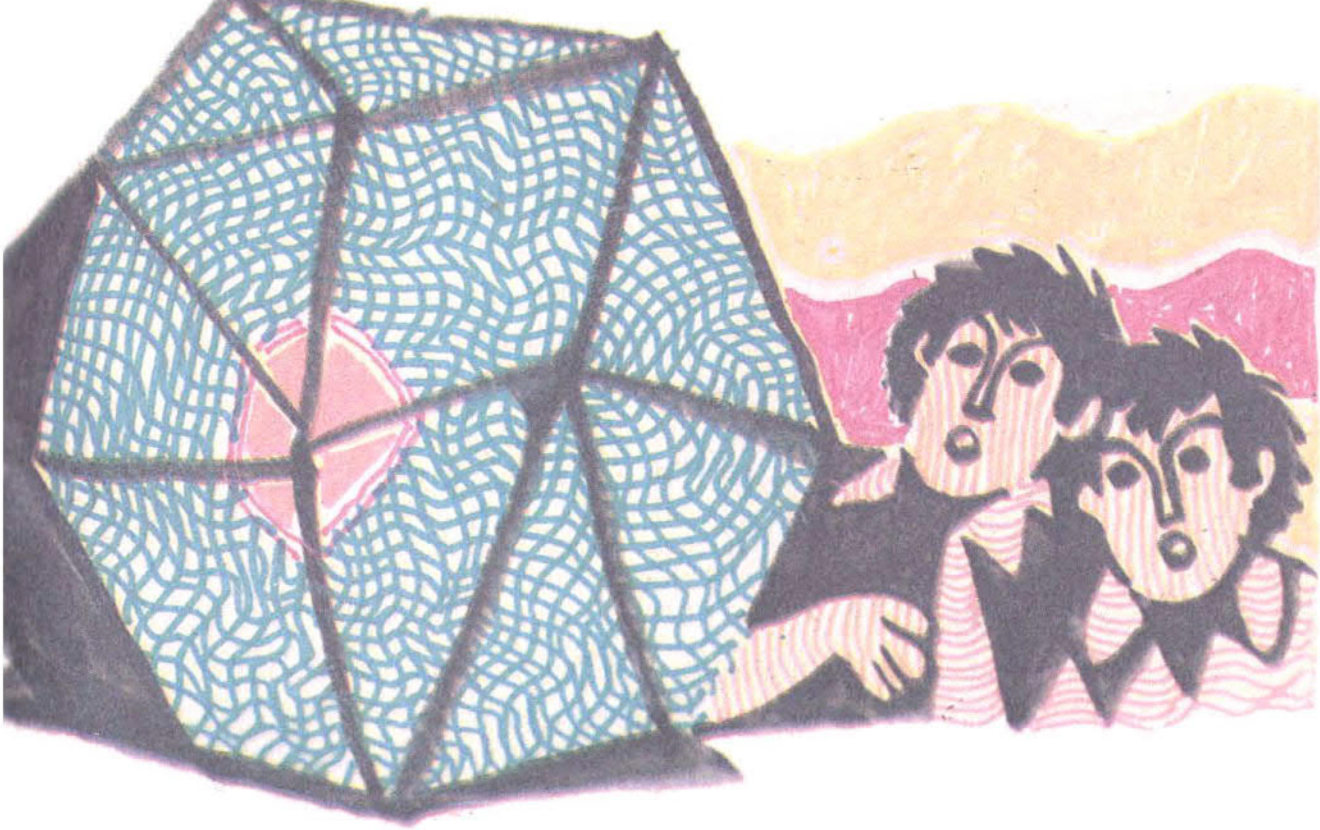
২ কার্তিক ১৩৯০ ১৯ অক্টোবর ১৯৮৩ ৯ বর্ষ ১৪ সংখ্যা

বৈদ্যুতিন প্রকাশক

খেলা ধুলো

https://kheladhulo.blogspot.com

পরিকল্পনা -সুজিত কুন্ডু ০ রূপায়ন -স্নেহময় বিশ্বাস



ছোটকা একমনে জিনিসটা পরিষ্কার করছিল। মুখ তুলে হেসে বলল, 'এটার নাম হল ব্লাস্টার গান—যা দিয়ে ব্লাস্ট করা যায়। সহজ কথায় হাওয়া-বন্দুক। এ-জিনিস কাউকে তাক করে ফায়ার করলে সে একেবারে হাওয়া হয়ে যাবে!'

দশ-এগারো বছর বয়েসের দুই পালোয়ান চোখ গোল-গোল করে মুখ হাঁ করে ছোটকার কাণ্ড-কারখানা লক্ষ করছিল, তার কথাও শুনছিল। দেখতে দুজনকে হুবহু একরকম, এমনকী গায়ের লাল জামা আর নীল প্যান্টজোড়া পর্যন্ত ছবির মতো মিলে যায়।

এই মুহূর্তে যে খোকাটি কোমরে দু-হাত রেখে ছোটকার কার্যকলাপের দিকে বাজপাখির মতো নজর মেলে তাকিয়ে আছে তার নাম চন্দ্রকান্ত। আর তার ঠিক পাশেই প্লাস্টিকের হালফ্যাশানের চেয়ারে আধ-বসা অবস্থায় যে শ্রীমান পাথরের মূর্তির মতো নট-নড়নচড়ন, তার নাম ইন্দ্রকান্ত।

ওদের নামদুটো সুন্দর হলে কী হবে, ছোটকা ওদের 'ঝালা-পালা' বলে ডাকেন। প্রথমে ওরা বুঝতে পারেনি ছোটকা ওদের ওরকম একটা অদ্ভুত নাম রেখে বসে আছেন। অল্প-অল্প করে বয়েসে বড় হয়ে উঠতেই ওরা ব্যাপারটা টের পেল। তখন সোজা গিয়ে হাজির ছোটকার দরবারে। সুবিচার চাই-ই চাই! মাথা নিচু করে মুখ গোমড়া করে দু-ভাই একযোগে অনুযোগ তুলল, 'ছোটকা, তুমি আমাদের ঝালা-পালা বলে ডাকো কেন? ওটা বাজে নাম।'

অভিমানে দু-জোড়া চোখ যেন জলে ভরে আসতে চায়।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে ছোটকা সাত-তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল যমজ-জুটির কাছে। মাথায় হাত রেখে বলল, 'জানিস, ছোট্টবেলায় তোরা দুজনে মিলে কান্নাকাটি

চিৎকার চেঁচামেচি করে বাড়িসুদ্ধ সবার কান ঝালা-পালা করে দিতিস ! সে-সময় আমার ফাইনাল পরীক্ষা চলছিল. তোদের চিৎকারে পড়াশোনা একেবারে ডকে। রেগে গিয়ে চটাস করে বইপত্তর বন্ধ করে তোদের মাকে বলেছিলুম, বৌদি, আজ থেকে এ-দুটোর নাম রাখলুম ঝালা-পালা । দাদা আদর করে যতই চন্দ্র-ইন্দ্র-বরুণ ইত্যাদি দেব-দেবীর নাম রাখুক আসলে ঝালা-পালাই এদের লাগসই নাম !' ছোটকা এবারে একগাল হাসল. 'ব্যস, সেই থেকে তোদের নামদুটো জমে গেল, বুঝলি ! চন্দ্রকান্ত হল ঝালা, আর ইন্দ্রকান্ত হল পালা ।'

ছোটকাকে ওরা দুজনেই খুব ভালবাসে । যখন-তখন ওদের বেড়াতে নিয়ে যায়, খেলার জিনিস কিনে দেয়, খাবার খাওয়ায় হরেকরকম । সুতরাং কিছুক্ষণ গোঁজ হয়ে থেকে দু'ভাই-ই রাজি হল ছোটকার কথায় । শুধু একটা শর্ত ছিল, 'কিন্তু ছোটকা, তুমি ছাড়া ঐ খারাপ নাম ধরে বাড়ির কেউ আমাদের ডাকতে পারবে না বলে দিচ্ছি ।'

সুতরাং ঐ শর্তেই রফা হয়েছিল ওদের ।

ঝালাপালার ছোটকা চাকরি করে ভারত সরকারের গোপন তদন্ত বিভাগে । চাকরির নানা গল্প সে শোনায় চন্দ্রকান্ত আর ইন্দ্রকান্তকে, শোনায় হাজার রকম তদন্তের কাহিনী । সুতরাং ছোটকাকে কাছে পেলেই ওদের প্রথমে আব্দার গল্প শোনানোর । আজ সেইরকম একটা আশা নিয়েই ছোটকার ঘরে এসেছিল ওরা । কিন্তু ঘরে ঢুকেই দেখে ছোটকা এক টুকরো ফ্লানেল নিয়ে কী একটা অস্ত্র এক মনে পরিষ্কার করছে ।

জিনিসটা দেখতে অদ্ভুত । অনেকটা রিভলভারের মতো, কিন্তু চেহারায় বেশ বদখত । প্রথমেই মোটা একটা সিসের নল—ইঞ্চি-চারেক লম্বা । তবে তার মধ্যের ফুটোটা খুব সরু । তারপর লাগানো একটা সিসের বাক্স—তার গায়ে দুটো বোতাম । একটার রঙ লাল, অন্যটার কালো । বাক্সের শেষে রয়েছে চ্যাপ্টা ধাতব বাঁট । তার সঙ্গে আংটা দিয়ে একটা খাটো চেন লাগানো ।

যন্ত্রটা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ছোটকা বলল, 'প্রফেসার শঙ্কুর গল্প পড়েছিস তো ? তাতে অ্যানাইহিলিন—মানে নিশ্চিহ্নাস্ত্র নামে একটা যন্ত্রের কথা বলা আছে । এ হল সেই জিনিস । যাকে টিপ করে ফায়ার করব সে একেবারে পারমাণবিক ধুলো হয়ে যাবে । এই লাল বোতামটা টিপলে প্রচণ্ড শক্তির রেডিও অ্যাকটিভ রশ্মি বেরিয়ে আসে । আর কালো বোতামটা টিপে দিলেই সব ঠাণ্ডা ।... এই অস্ত্রটা আমাকে অফিস থেকে নতুন দিয়েছে, বুঝলি ! তদন্তের কাজে দিন-দিন যা বিপদ বাড়ছে !'

ব্লাস্টার সাফাইয়ের কাজ শেষ করে ছোটকা সেটা একটা বাক্সে বন্দী করে রাখতে যাচ্ছিল, কিন্তু চন্দ্রকান্ত হঠাৎ বলে উঠল, 'ছোটকা, তুমি সত্যি কথা আমাদের খুলে বললে না কিন্তু । অফিস থেকে তোমাকে যখন ব্লাস্টার দিয়েছে নিশ্চয়ই তার সঙ্গে নতুন কোনো তদন্তের ব্যাপার আছে, তাই না ?'

ছোটকার মুখে বাহবা দেবার হাসি ফুটে উঠল । ব্লাস্টারটা টেবিলে নামিয়ে রেখে চেয়ারে গা এলিয়ে বসল । বলল, 'ঝালা-পালা, তোরা ঠিক ধরেছিস । একটা নতুন কাজের ভার দেওয়া হয়েছে আমাকে । খুব বিপজ্জনক কাজ । কাউকে বলা বারণ । আর যদি তোদের বলি তাহলে উলটে তোদের বিপদ বাড়বে । তবে খুব সংক্ষেপে ঝাপসাভাবে একটু আভাস দিতে পারি, তার বেশি একদম নয় । কী, শুনতে রাজি ?'

ঝালা-পালা তো এককথায় রাজি !

'তবে শোন...' বলতে শুরু করল ছোটকা । তার ভুরু কুঁচকে গেল সামান্য ।

হাতের আঙুলগুলো আলতো করে বোলাতে লাগল ব্লাস্টারের সিসের বাক্সে। চন্দ্র ও ইন্দ্র টেবিলের আরও কাছে এসে দাঁড়াল।

'কাজটা আর কিছুই নয় রে, ভারতের বড়সড় বিজ্ঞানীদের নিয়ে একটু খোঁজখবর।' ছোটকা ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকাল। বিকেলের নীল আকাশে কালির ফুটকির মতো দুটো চিল উড়ে বেড়াচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আবার, 'গত কয়েক বছর ধরে আমাদের বিজ্ঞানীদের গবেষণায় বেশ গোলমাল হচ্ছে। যেমন আগে যারা জলদি-জলদি আবিষ্কার-টাবিষ্কার করে সব্বাইকে তাক লাগিয়ে দিত এখন তারা সবাই কেমন যেন থিতিয়ে পড়েছে। এমনিতে কি গবেষণায় মানুষের ভাটা পড়ে না, তা পড়ে। কিন্তু এ যেন একেবারে ওলটপালট ব্যাপার! জ্ঞানীগুণী মানুষগুলো যেন রাতারাতি বোকা বনে গেছে। তাই রাষ্ট্রপতির নির্দেশে আমাদের গোপন তদন্ত বিভাগ এ-বিষয়ে তদন্তের ভার নিয়েছে। তারপর ঘুরে ফিরে তারই কিছুটা দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে।'

ঝালা-পালা কিছু বলে ওঠার আগেই একটা চিৎকারে তিনজনের পিলে চমকে ওঠার যোগাড়।

'আমার ঘাড়ে—আমার ঘাড়ে ব্যা . . . ঘাড়ে ব্যা . . . ব্যা

তীক্ষ্ণ ধাতব কণ্ঠস্বর যেন কানে পিন ফোটাচ্ছে। কাচের গেলাসে চামচ ঠুকলে যেরকম আওয়াজ হয় এটা যেন অনেকটা সেই রকম।

চিৎকার যে করছে সে তখনও ঘরে এসে ঢোকেনি। তবে এদিক পানেই ছুটে যে আসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ছোটকা আস্তে আস্তে বলল, 'আমার কথা শুনে ভ্যাঙাচ্ছে নাকি রে! তা শেষে আবার ব্যা-ব্যা করে ছাগলের ডাকটা জুড়ে দিয়েছে কেন?'

চন্দ্র ও ইন্দ্র এ-ওর দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'আসুক এ-ঘরে, মজা দেখাচ্ছি!'

ঠিক তক্ষুনি চিৎকারের মালিক ঘরে ঢুকল। না, ছাগল নয়। তবে 'ব্যা-ব্যা' চিৎকারটা সে এখনও করে চলেছে। তাকে দেখেই ঝালা-পালা একসঙ্গে ধমকে উঠল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু!'

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুক স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে বাধ্য ছেলের মতো।

ছোটকা হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'ঝামেলাকে নিয়ে দেখছি ঝামেলার শেষ নেই।'

ঝামেলা নামধারী প্রাণীটি—উহুঁ, বস্তুটি—একটি রোবট। না, রোবট ঠিক নয়, বরং বাচ্চা-রোবট বললেই বেশি মানানসই হয়। কিন্তু যেহেতু সে রোবট সেহেতু ঝালা-পালার আদেশে স্ট্যাচু না হয়ে তার উপায় ছিল না।

ঝামেলার উচ্চতা মাত্র তিন ফুট। মাথাটা পাঁচ নম্বর ফুটবলের মতো প্রকাণ্ড; ধাতুর তৈরি বলে সবসময় রুপোর মতো ঝকঝক করছে। হাত-পাগুলো কাঠির মতো সরু লিকলিকে। কিন্তু আঙুলগুলো পর্যন্ত নিখুঁত করে তৈরি—ঠিক যেন একটা পুতুল। পুতুলের মতোই সবসময় ও জামা-প্যান্ট পরে থাকে। খুব জোরে ছুটতে না পারলেও হাঁটতে পারে হেলেদুলে। আর কথা বলতে পারে নিজের ইচ্ছেমতো—কিন্তু গলার স্বরটা রিনরিনে, মেয়েলি।

পঞ্চাশ কেজি ওজনের এই বাচ্চা-রোবটটা ছোটকাই তৈরি করে উপহার দিয়েছে ঝালা-পালাকে। দেবার সময় বলেছিল, 'দিন-রাত্তির তোরা কান ঝালাপালা করিস, এবারে মেতে থাক ঝামেলাকে নিয়ে।'

ইলেকট্রনিক্স-বিদ্যায় ছোটকার জুড়ি

নেই। সেই কোন্ ছোটবেলা থেকেই নাকি নানান্ অটোমেটিক জিনিস বানাত। চন্দ্র-ইন্দ্র সে-কথা শুনেছে বাবার কাছে। আর ঝামেলাকে তৈরি করতে গিয়ে কম কেরামতি দেখায়নি ছোটকা। বাচ্চা-রোবটটার চোখদুটো যেন টেনিসবল সাইজের কাচের গুলি—ঠেলে বেরিয়ে আছে বাইরে। আসলে ও-দুটো পুঞ্জাক্ষি, যেমনটা মাছির থাকে। অনেকগুলো লেন্স মিলিয়ে তৈরি চোখ। তাছাড়া, ঝামেলার চোখদুটো এমন যে আট মাইল দূর পর্যন্ত ও স্পষ্ট দেখতে পায়। ঠিক টেলিস্কোপের মতো।

ঝামেলার কানদুটোও বিচিত্র। মানে কানের জায়গায় রয়েছে দুটো ফুটো। কিন্তু তার ভেতরে নাকি এমন সব কলকব্জা আছে যে-কোনো শব্দই ওর কান এড়িয়ে যাবার জো নেই। মানুষ শুনতে পায় না এমন অনেক শব্দ আছে যেগুলো শুধু পশু-পাখিরা শুনতে পায়—যাকে বলে আলট্রাসনিক। ঝামেলার শ্রবণশক্তি থেকে কোনো শব্দেরই রেহাই নেই। তাই ছোটকা মাঝে মাঝে বলে, 'এরকম একটা জম্পেশ রোবট তোদের প্রেজেণ্ট করলুম, অথচ এটা আমাকে তদন্তে করতে হেল্প করতে পারত! কী চোখের নজর, আর কী কান! কিন্তু ঝামেলার তো একটাই ঝামেলা! ও এখনও সভ্যসমাজে ঘুরে বেড়ানোর মতো ভদ্রতা রপ্ত করতে পারেনি। যখন-তখন যা-তা গোলমাল বাধায়। তাছাড়া, এখন তো ওর ট্রেনিং চলছে তোদের কাছে। পোষা কুকুর-বেড়ালের মতো ওকেও ট্রেনিং দিয়ে মানুষ করতে হবে, বুঝলি!'

ছোটকা ঠিকই বলেছে। কারণ ঝামেলা এখনও সব বাংলা শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। হুট-হাট করে আটকে যায়, নয়তো ভুলভাল বলে বসে। যেমন এখন 'ব্যা-ব্যা' করে চিৎকার করছিল।





সে-কথা ছোটকাকে বলতেই ছোটকা বলল, 'ওর তো ঘাড়ের ভেতর ব্যাটারি থাকে। সেই ব্যাটারিতে কোনো গোলমাল হয়নি তো ?'

চন্দ্র-ইন্দ্র একমত হল যে সে-কথা ঝামেলাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখা যেতে পারে। অতএব চন্দ্র বলে উঠল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু কাটাকুটি। এদিকে এসো। কী হয়েছে বলো তো।'

স্ট্যাচু হয়ে থাকলেও ঝামেলা সবকিছু শুনছিল এতক্ষণ। সুতরাং আদেশ পেতেই তাড়াহুড়ো করে কীসব বলতে গিয়ে কিছুক্ষণ কিচিরমিচির করল, টলমল করে ঘুরপাক খেল। তারপর ঘাড়ে হাত দিয়ে সরু গলায় বলল, 'ব্যাটারি নয়, ব্যথা। ও-ঘরে খাটের তলায় আরশোলা ধরতে গিয়ে ঘাড়ে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি।'

ছোটকা হো-হো করে হেসে উঠল ঝামেলার কথা শুনে। বলল, 'ও তো দেখছি এখনও চলতি ভাষায় কথা বলতে শেখেনি। অ্যাদ্দিনেও গুরু-চণ্ডালি দোষ কাটাতে পারলি না তোরা! কিন্তু ও আরশোলা ধরে কেন বল্ তো ? প্রায়ই দেখি খাটের তলায়, নর্দমার ধারে আরশোলার খোঁজে ঘোরাঘুরি করে। ও কি আরশোলা খায় নাকি রে ?'

ইন্দ্রকান্ত ব্যাজার মুখে বলল, 'ঝামেলাকে একথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছোটকা। তাতে ও বলেছে লক্ষ-লক্ষ বছরেও আরশোলার কোনো বিবর্তন হয়নি। অথচ বানররা মানুষ হয়ে তা থেকে রোবট হয়ে গেল। সুতরাং ঝামেলার কর্তব্য আরশোলা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ওদের বিবর্তনে সাহায্য করা।'

ইন্দ্র থামতেই ছোটকা অবাক হয়ে বলল, 'বানর তো মানুষ হয়েছে বুঝলাম, কিন্তু মানুষ থেকে কবে আবার রোবট হল!'

ইন্দ্রকান্ত গম্ভীর মুখে জবাব দিল, 'কী জানি, ঝামেলার দারুণ বিশ্বাস মানুষ থেকেই

বিবর্তন হয়ে রোবট তৈরি হয়েছে। তাই জন্যে আমাদের সব্বাইকে ও নিজের পূর্বপুরুষ ভাবে। দেখো না, কথায়-কথায় বলে, কোন্ আদ্যিকালে তোমরা পড়ে রয়েছ ভাবলে দুঃখ পাই!'

ছোটকা আবার ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল।

ঝামেলা ওর পুঞ্জাক্ষি দিয়ে ছোটকার ঘরের আনাচ-কানাচ সার্চ করছিল আরশোলার খোঁজে। ছোটকার হাসি কানে ধাক্কা মারতেই হেলেদুলে ওদের কাছে এল। তারপর বলল, 'কী হইল, অট্টহাস্যের কোনো কারণ ঘটিয়াছে কি?'

এবারে ঝালা-পালাও যোগ দিল ছোটকার অট্টহাসিতে। আর ঝামেলা কিছু বুঝতে না পেরে তিড়িং-বিড়িং করে লাফাচ্ছে। ওর কপালে লাগানো লাল-নীল-হলদে-সবুজ ছোট-ছোট বাতিগুলো দপদপ করে জ্বলছে আর নিবছে।

ঝামেলা খুশি হলে বা উত্তেজিত হলেই আলোগুলো অমন করে জ্বলে-নেবে।

॥ দুই ॥

ঝালা-পালা আর ঝামেলা যখন বাড়ির বাইরে বেরোল, বিকেল তখন ঢলে পড়তে চলেছে। পশ্চিম দিকের আকাশটি আপেল আর কমলালেবুর রঙে মাখামাখি। তারই মাঝে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নানান ঘর-বাড়ি-জন্তু-জানোয়ারের চেহারা নিয়ে সাদাটে মেঘের জমাট পাহাড়।

রোজ বিকেলে চন্দ্রকান্ত ও ইন্দ্রকান্ত খেলতে বেরোয় মাঠে। খেলা বলতে বল পেটাপেটি বা এলোমেলো ছুটোছুটি হুটোপাটি। ওদের বাড়ির সঙ্গে আছে লাগোয়া বাগান, তাতে রঙ-বেরঙের ফুল আর পাতাবাহার। বাগান পেরোলেই পিচের রাস্তা। তারপর রাস্তা পেরোলেই মখমলের মতো সবুজ ঘাসে ঢাকা বিশাল মাঠ। মাঠেই এখানকার ছেলেমেয়েরা খেলা করে, লোকজন সব বেড়াতে বেরোয়।

সবুজ মাঠের পাশ ঘেঁষেই শুরু হয়েছে ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া গাছের দঙ্গল। তেমন ঘন নয় যে জঙ্গল বলা যাবে, কিন্তু তা বলে খুব তুচ্ছ করার মতন নয়। নানান পাখি আর শেয়াল নাকি আস্তানা গেড়েছে ওই গাছের জটলার ভেতরে।

চন্দ্রকান্ত, ইন্দ্রকান্ত আর ঝামেলা পিচের রাস্তা পেরিয়েই ছুট লাগাল মাঠে। ঝামেলা জোরে ছুটতে পারে না, তাই পড়ে গেছে সবার পিছনে। তার ওপর বেচারার হাতে ঝালা-পালা ওদের খেলার ফুটবলটা ধরিয়ে দিয়েছে। তবু হেলেদুলে টলতে-টলতে ঝামেলা যথাসম্ভব জোরে দৌড়তে চেষ্টা করছে।

বিকেলের আলোয় অন্যান্য ছেলের দল নানান খেলা খেলছে। ঝালা-পালা আর ঝামেলাও রোজকার মতো খেলা শুরু করল।

খেলা পুরো দমে চলছিল, এমন সময় হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বাচ্চা-রোবট, ঝামেলা। কিছুক্ষণ ঘাড় কাত করে কী যেন শোনবার চেষ্টা করল, তারপর বলে উঠল, 'শব—শব—শব্দ! নতুন ধাঁচের শব্দ। খোঁজ করা দরকার।'

ঝালা-পালাও খেলা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। জিজ্ঞেস করল অবাক হয়ে, 'কোন্ দিক থেকে আসছে শব্দটা?'

শব্দটা ঝালা-পালার কানে আসছে না। কিন্তু ঝামেলা যখন শুনতে পাচ্ছে তখন শব্দটা নির্ঘাত আলট্রাসনিক।

ঝামেলা মনোযোগ দিয়ে শব্দটা ঠাহর করার চেষ্টা করছিল। মিনিটখানেক পর কী যেন একটা বলতেও শুরু করল ও। কিন্তু ওর মিহি গলা ছাপিয়ে একটা ভরাট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল ওরা তিনজন—

'হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদী,

তিনজনেতে জটলা ক'রে ফোক্‌লা

হাসির পাল্লা দি।'

চমকে ফিরে তাকাতেই খুব চেনা-মজার মানুষটাকে দেখতে পেল ওরা। প্রফেসার নিধিরাম পাটকেল। নেড়া মাথায় অল্পস্বল্প খোঁচা-খোঁচা চুল, বেড়ালের গোঁফের মতো খ্যাংরা গোঁফ, কালো জামা, কালো প্যান্ট, পায়ে মোজা এবং বুট জুতো। ভদ্রলোক নামকরা উদ্ভিদবিজ্ঞানী—বটানিস্ট। ঝালা-পালাদের তিনটে বাড়ি পরেই থাকেন। ভীষণ খামখেয়ালি আর ভাবুক। তবে সুকুমার রায়ের আবোল-তাবোল-এর প্রত্যেকটি ছড়া তাঁর মুখস্থ। ঝালা-পালা মানিকজোড়কে দেখলেই আবোল-তাবোলের কোনো না কোনো ছড়া শুনিয়ে দেন প্রফেসার নিধিরাম।

ঝালা-পালাকে তাঁর দিকে তাকাতে দেখেই প্রফেসার কোমরে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বলো দেখি, কোন্ ছড়া ?'

ঝালা–পালা একসঙ্গে বলে উঠল, আহ্লাদী !'

'কারেক্ট ! এই নাও টফি !' বলে ঝালা ও পালাকে একটা করে টফি দিলেন প্রফেসার। তারপর বললেন, 'আচ্ছা, আমি এবার চলি। চটপট কিছু গাছপালা খুঁজে বের করতে হবে।'

প্রফেসার নিধিরাম এখন যে মাঠ পেরিয়ে গাছপালার রাজ্যে ঢুকবেন সেটা ঝালা-পালা বেশ ভাল করেই জানে। রোজই বিকেলে উনি ঐ আধা-জঙ্গলে ঢোকেন গাছের ছাল-পাতা-শিকড়-বাকড়ের যোগাড়ের সন্ধানে। তারপর তা নিয়ে কীসব এক্সপেরিমেন্ট চালান।

আসলে কিন্তু প্রফেসার নিধিরাম পাটকেলের নাম অজয়েন্দ্র সেনশর্মা। ওঁর এই ছদ্মনামটা ঝালা-পালাই দিয়েছে ওদের ছোটকার অনুকরণে। কারণ প্রফেসার সেনশর্মা সর্বদা আবোল-তাবোল আউড়ে বেড়ান, গাছের ছাল থেকে নতুন ধরনের তেল আবিষ্কার করেছেন, তৈরি করেছেন অতি বিকট গন্ধ ও ঝাঁঝওয়ালা বড়ি—যে বড়ির গন্ধে শস্যখেত থেকে কীটপতঙ্গ পালাবে, মশা-মাছিও চম্পট দেবে ত্রিসীমানা থেকে। সুকুমার রায়ের সমস্ত লেখা ঝালা-পালার একেবারে মুখস্থ। তাই ওরা দুজনে জানে সুকুমার রায়ের 'সত্যি' গল্পের প্রফেসার নিধিরাম পাটকেলের কথা। নিধিরাম পাটকেল আবিষ্কার করেছিলেন গন্ধবিকট তেল আর কামানের দুর্গন্ধবিকট গোলা। তাছাড়া, অজয়েন্দ্রবাবুর চেহারাও যেন অবিকল সুকুমার রায়ের আঁকা নিধিরামের ছবির মতো।

ওদের এই নতুন নামকরণ শুনে ছোটকা বেশ মজা পেয়েছিল।

আর ঝামেলা তিড়িং-তিড়িং লাফিয়ে মিহি গলায় আনন্দ প্রকাশ করে বলে উঠেছে, 'ফুজিয়ামা ! ফুজিয়ামা !'

ফুজিয়ামা জাপানের এক নামকরা আগ্নেয়গিরি। তার সঙ্গে উত্তেজনা বা আনন্দের যে কী সম্পর্ক তা একমাত্র ঝামেলাই জানে। তবে উত্তেজিত হলে বা খুশি হলে ঐ কথাটা ওর বলা চাই।

প্রফেসার নিধিরাম চলে যেতেই ঝামেলা আবার বলল, 'শব্দটা এখনও রয়েছে। ওটা জঙ্গলের দিক থেকে আসছে !' বলে গাছ-গাছালির দিকে আঙুল দেখিয়ে সেদিকে হেলেদুলে ছুটতে আরম্ভ করল ঝামেলা। অগত্যা চন্দ্র-ইন্দ্রও ওর পেছনে দৌড়ল।

আকাশ অন্ধকার-অন্ধকার হয়ে এসেছে। মাঠের লোকজন-ছেলেমেয়ে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হয়েছে। কিন্তু ওরা তিনজন ছোট-ছোট পা ফেলে ছুটে চলেছে। ঝাল্া-পালা দেখল ওরা জঙ্গলের যে অংশ লক্ষ করে এগিয়ে যাচ্ছে, একটু আগেই সেখানে ঢুকে পড়ে অদৃশ্য হয়েছেন প্রফেসার নিধিরাম পাটকেল।

ছোটকা বলছিল বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার

থিতিয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রফেসার নিধিরামের আজব আবিষ্কারে মোটেও ভাঁটা পড়েনি। জঙ্গলে ঢুকে এখন তিনি কী করছেন কে জানে!

'ঐ যে, দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি!' উত্তেজনায় চিঁহি-চিঁহি স্বরে চেঁচিয়ে উঠল ঝামেলা, 'একটি সবুজাভ প্র—প্র—পাথর! উহা হইতে আলো নির্গত হচ্ছে!' বোঝা গেল 'প্রস্তর' উচ্চারণ করতে গিয়ে নাজেহাল হয়ে 'পাথর' বলল ও।

যে সবুজ পাথরের কথা ঝামেলা বলছে সেটা ও একাই দেখতে পাচ্ছে। ঝালা-পালার তো ওর মতো টেলিস্কোপিক চোখ নেই!

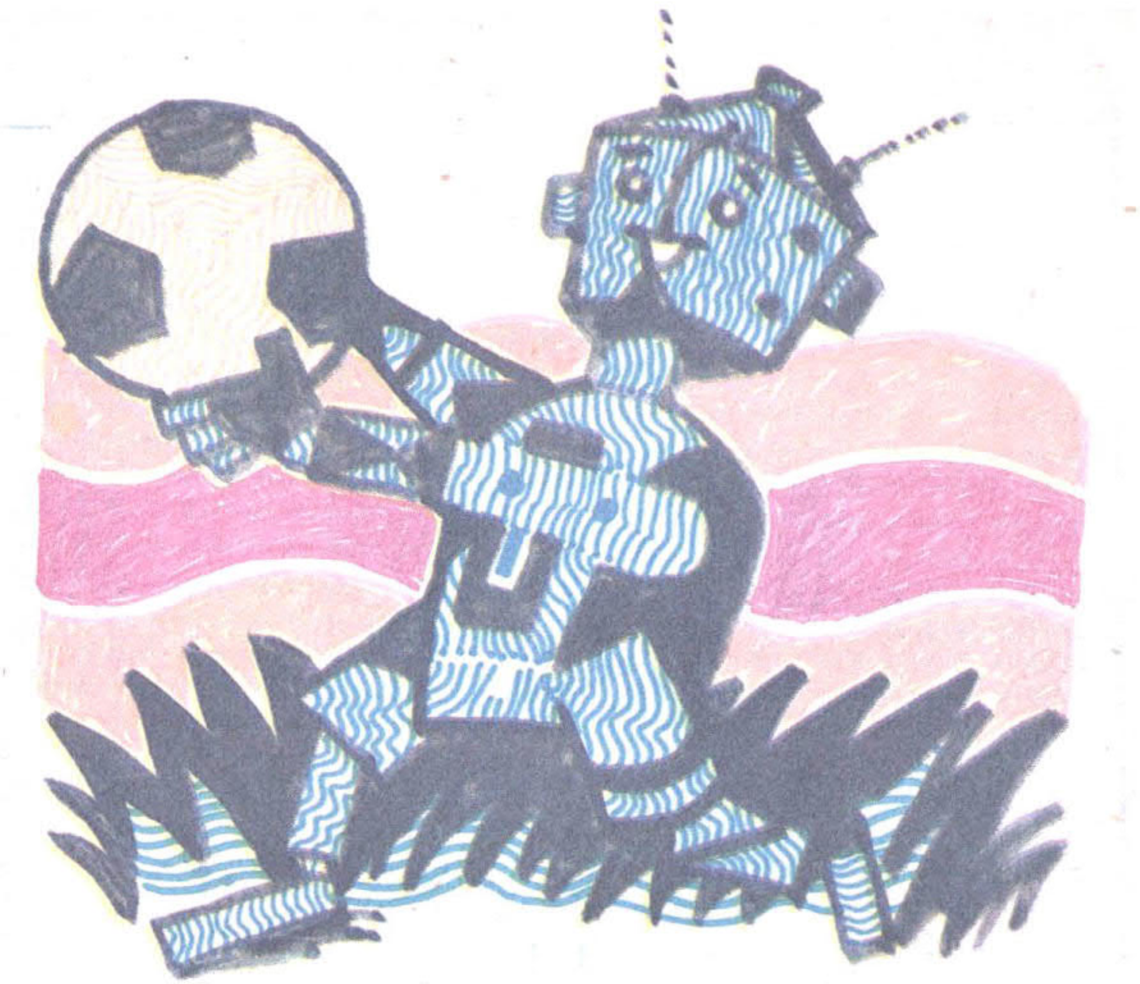
জঙ্গলে ঢুকতেই সবুজ ঘাস মাপে অনেক বড় এবং ঘন হয়ে গেছে। ঝোপঝাড়ও চোখে পড়ছে কিছু-কিছু। এছাড়া সব বিশাল-বিশাল দেবদারু, শাল, শিমুল একপায়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। মাঠে তবু বা কিছু আলো ছিল, জঙ্গলের ভেতরে বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে। চারপাশে তাকিয়ে ঝালা-পালার গা শিরশির করতে লাগল। বাতাসের ঝাপটা গাছের অলি-গলি পেরিয়ে গায়ে এসে লাগছে।

ঝামেলা কিন্তু বেশ নিশ্চিত পা ফেলে হেঁটে চলেছে সবার আগে। কখনও পায়ে চলা সরু পথ ধরে, কখনও বা পথের বাইরে ঘাস-ঝোপ ঠেলে। মাথার ওপর থেকে ভেসে আসছে পাখির কিচিরমিচির। ওরা সব ঝাঁক বেঁধে বাসায় ফিরছে।

আরও কিছুটা এগোতেই ইন্দ্র চন্দ্রকে বলল, 'ফিরে চল্, আর ভেতরে ঢোকা ঠিক হবে না।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ঝামেলার চিৎকারে





ওরা চমকে উঠল। 'ওঃ, ফুজিয়ামা! পাইয়াছি রে, পাইয়াছি!'

ওরা তিনজনেই এবারে স্পষ্ট দেখতে পেল সবুজ পাথরটা। সরু পথের ডান দিকে .বেশ কিছুটা ভেতরে ঘন ঘাস-ঝোপের ফাঁকে চুপটি করে বসে রয়েছে টেনিস বলের সাইজের একটা উজ্জ্বল সবুজ পাথর। ঠিক যেন একটা পান্না। চন্দ্রকান্ত এক লাফে এগিয়ে গিয়ে ডান হাতে তুলে নিল পাথরটা। তারপর এসে দাঁড়াল বাকি দুজনের কাছে।

পাথরটার গা বলের মতো মসৃণ নয়, কারুকাজ করে নিপুণ হাতে কাটা, তাছাড়া যে জিনিসটা সবচেয়ে অবাক করে দেয় তা হল, পাথরটার ঠিক কেন্দ্রে একটা টকটকে লাল আলো জ্বলছে। সেই আলোটা পাথরের ভেতরে তৈরি করেছে এক অপূর্ব লালচে আভা। ঘনিয়ে আসা অন্ধকারে আলোর আভা চমকে দেবার মতো জ্বলজ্বল করছে।

চন্দ্র বলল, 'পাথরটা হাতে কেমন যেন গরম-গরম ঠেকছে!'

ইন্দ্র অবাক হয়ে গেল এ কথাটা শুনে। হঠাৎ ও ঝামেলার দিকে তাকাতেই দেখে ও দু কানের ফুটোয় হাত চাপা দিয়ে দাঁড়িয়ে। ইন্দ্র জিজ্ঞেস করতেই ঝামেলা চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'শব্দে আমার কান ফেটে যাচ্ছে। তোমাদের তো আর কিছু না!'

আলট্রাসনিকে ঝামেলার কষ্ট হচ্ছে দেখে চন্দ্রকান্ত পাথরটা চট করে ওর হাফপ্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে ফেলল। ঝামেলা সঙ্গে সঙ্গে কান থেকে হাত নামাল।

এমন সময় একটা শেয়ালের ডাক শুনতে .পেল ওরা। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে তিনজন বাড়ির দিকে ছুট।

ছুটতে ছুটতে চন্দ্র বলল, 'ছোটকার ব্লাস্টারটা সঙ্গে থাকলে ভাল হত। শেয়ালটাকে হাওয়া করে দিতাম।'

ঝামেলা দৌড় প্রতিযোগিতায় কিছুটা পিছিয়ে পড়েছিল। চেঁচিয়ে বলল, 'তোমরা

শেয়ালকে ভয় পাও ! আমি একটুও ভয় পাই না !'

'তাহলে থাকো না। পালাচ্ছ কেন ?' ইন্দ্র মুখ না ফিরিয়েই বলে উঠল।

ঝামেলা জবাব দিল, 'শৃগাল বড় অসভ্য। গা চেটে দিতে পারে। তাই নিরাপদ দূরত্বে সরিয়া যাইতেছি।'

চন্দ্র-ইন্দ্র ফিরে তাকালে দেখতে পেত, ঝামেলার কপালে লাল-নীল বাতিগুলো দপ দপ করে জ্বলছে, উত্তেজনায়। আর এও দেখতে পেত দূরের একটা দেবদারু গাছের আড়াল থেকে একটা ছায়ামূর্তি ওদের লক্ষ করছে।

॥ তিন ॥

সে রাতেই ছোটকার ঘরে মিটিং বসল।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুম মাথায় উঠল ঝালা-পালার। মাকে আদর আবদার করে রাজি করিয়ে দুই যমজ পালোয়ান সোজা হাজির ছোটকার ঘরে। সন্ধে বেলাতেই পড়াশোনার ফাঁকে রহস্যময় সবুজ পাথর খুঁজে পাওয়ার ঘটনাটা ইন্দ্রকান্ত বলেছিল ছোটকাকে। এও বলেছিল, পাথরটা থেকে আলো বেরোচ্ছে এবং আলট্রাসনিক শব্দও পাওয়া যাচ্ছে অবিরাম।

পাথরটা অবাক চোখে বহুক্ষণ ধরে দেখে ছোটকা ভুরু কুঁচকে আস্তে আস্তে বলল, 'ব্যাপার গুরুচরণ মনে হচ্ছে রে। এ-পাথরটা সাধারণ পাথর নয়। সন্দেহ একটা হচ্ছে, তবে পরীক্ষা না করে কারেক্টলি বলতে পারছি না। এটা নিয়ে আমি এক্ষুনি অফিসে যাব। সেখানে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট-ফেস্ট করে রাতে ফিরব। তখন তোদের সঙ্গে ডিটেল্‌স্ আলোচনা করব, কেমন ?'

ঝালা-পালা দেখল, ছোটকা হঠাৎ কেমন যেন সিরিয়াস হয়ে গিয়ে পাথরটা ভাল করে কাগজে মুড়ে নিল। তারপর অফিসে বেরোবার পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে নিল ঝটপট। শেষে ব্লাস্টারটাকেও গুঁজে নিল জামার ভেতরে বগলের নীচে। তারপর বলল ঝালা-পালাকে, 'কোনো ভয় নেই। যা, পড়তে বোস।' বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। পরক্ষণেই বাইরে থেকে মোটরবাইক স্টার্ট দেবার শব্দ পাওয়া গেল। রওনা হয়ে গেল ছোটকা।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ঝামেলা চুপটি করে এতক্ষণ সব দেখছিল এবং শুনছিল। ছোটকা রওনা হয়ে যেতেই সেতার বাজানো সুরে বলে উঠল, 'পাথরটা নিশ্চয়ই ট্রান্স-ট্রান্সমিটার। আলট্রাসনিক দিয়ে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে।'

চন্দ্র ও ইন্দ্র অবাক হয়ে ঝামেলার দিকে তাকাল। ট্রান্সমিটার। জঙ্গলের মধ্যে ট্রান্সমিটার পড়ে থাকবে কেন ? আর ঐ ট্রান্সমিটার খবর পাঠাচ্ছিলই বা কাকে ? ওরা দুজনে বহু ভেবেও কোনো উত্তর খুঁজে পেল না। অতএব পড়ার ঘরে এসে বই নিয়ে বসল। ঝামেলা কিছুক্ষণ ওদের সামনে বসে রইল। তারপর লিকলিকে হাত দিয়ে ফুটবলের মতো চকচকে মসৃণ মাথায় হাত বুলিয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'যদি বলো তো একটু রান্নাঘরে যাই—'

একটু থেমে ও আবার মিহি গলায় মিনমিন করে বলল, 'ওখানে আরশোলার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। কয়েকটা ধরি গিয়ে—'

ঝামেলা উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে রওনা হয়ে গেল রান্নাঘরের দিকে।

ঝালা ও পালা যুক্ত ও মুক্ত কণ্ঠে পড়তে শুরু করল। কিন্তু কোনো পড়াই ওদের মাথায় ঢুকছিল না। মনের মধ্যে শুধু সবুজ পাথরটাই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

ছোটকা বেশ রাত করেই অফিস থেকে ফিরল। তারপর চটপট খাওয়াদাওয়ার পালা সেরে ঘরে ফিরে দেখে ঝালা-পালা



তার বিছানায় বসে অপেক্ষা করছে। ওদের চমৎকার চোখ দুটো কৌতূহলে চকচক করছে। ছোটকা চেয়ার টেনে ওদের কাছে এসে বসল। গম্ভীর গলায় বলল, 'যা সন্দেহ করেছিলাম তাই। পাথরটা সাধারণ পাথর নয়—একটা নতুন ধরনের ট্রান্সমিটার।'

ঝালা-পালা বলল, 'জানতাম।'

'জানতি ? কী করে জানলি ?' ছোটকা তো অবাক।

খাটের তলায় কিছুক্ষণ ধরে খুটুর-খাটুর শব্দ হচ্ছিল, হঠাৎই সেখান থেকে হামাগুড়ি দিয়ে ঝামেলা বেরিয়ে এল। বলল, 'আমি বলেছি ! তা পাথরটা কোথায় ? আওয়াজ পাইতেছি না যে !'

চন্দ্র ইন্দ্রকে বলল, 'ঝামেলাকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা কর্। নইলে সব আলোচনা পণ্ড করে দেবে ফোড়ন কেটে।'

ইন্দ্র ঝামেলাকে বলল, 'তন্বীতমালতালিবনরাজিনীলা—এই কথাটা বানান করে উচ্চারণ করো দেখি। ও-ঘরে গিয়ে শুয়ে শুয়ে প্র্যাকটিস করো, কাল সকালে জিজ্ঞেস করব।'

ঝামেলা কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে তারপর ঘর ছেড়ে রওনা হল। আর একই সঙ্গে মিহি গলায় বানানটা করবার চেষ্টা করতে লাগল, 'ত—ত—তন্...'

ও চলে যেতেই ছোটকা হেসে ইন্দ্রকে বলল, 'দারুণ দিয়েছিস। ব্যাটা আজ রাতের মতো আচ্ছা জব্দ হয়েছে।' তারপর একটু থেমে বলল, 'তা শোন্, ঝামেলা ঠিকই ধরেছে। পাথরটা আমি অফিসে রেখে এসেছি। ওটার ওপরে এখনও অনেকরকম এক্সপেরিমেন্ট চলছে। পাথরটা আমাদের বড়সায়েবকে বেশ চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। কী করে তোরা পাথরটা পেলি গোটা ব্যাপারটা ভাল করে খুলে বল্ দেখি ! কিচ্ছু বাদ দিবি না।'

তখন ঝালা-পালা পালা করে বলতে



শুরু করল। ছোটকা একটা চুরুট ধরিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। বোঝা গেল সে-ও কম দুশ্চিন্তায় পড়েনি।

ওদের সব কথা শোনার পর ছোটকা চোখ ছোট করে প্রশ্ন করল, 'তোদের আগে প্রফেসার নিধিরাম, মানে প্রফেসার সেনশর্মা ঐ জঙ্গলে ঢুকেছিলেন?'

'হ্যাঁ। তবে তিনি তো রোজই ঢোকেন। রাজ্যের গাছ-পাতা যোগাড় করে ফিরে আসেন।'

'আজকে কখন ফিরলেন?'

'তা তো দেখিনি!' এবারে ঝালা-পালা সত্যিই অবাক হল। প্রফেসার নিধিরাম রোজই সন্ধে ঘনিয়ে আসার আগে বেরিয়ে আসেন জঙ্গল থেকে। আজ তো তাঁকে দেখা যায়নি। ঝালা-পালা ও ঝামেলা যখন জঙ্গল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসছিল তখন তো বেশ অন্ধকার করে এসেছে! জঙ্গলের ভেতরে প্রফেসারের কোনো বিপদ হয়নি তো? তিনি বেশ নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করছিলেন। তাইতেই হিংসে করে কেউ তাঁকে বিপদে ফেলেনি তো?

সন্দেহগুলো ছোটকাকে খুলে জানাতেই ছোটকার চুরুটের টান দ্বিগুণ জোরালো হয়ে গেল। ধীরে ধীরে সে বলল, 'ঝালা-পালা, অবস্থা এখন যা দাঁড়িয়েছে তাতে তোদেরও কিছু-কিছু খোলসা করে বলা দরকার। আজ সকালেই বিজ্ঞানীদের নিয়ে যে গোলমালের কথা বলছিলুম সেটা আসলে হল এইরকম: ভারতের মোট চারজন বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা একেবারে সবার সেরা। প্রথমজন ব্যাঙ্গালোরের প্রফেসার রায়না, দ্বিতীয় জন বম্বে আই আই টি-র প্রফেসার শ্যামমূর্তি, তিন নম্বর আমাদের অজয় সেনশর্মা, আর শেষ জন মাদ্রাজের প্রফেসার চিদাম্বরম।'

ছোটকা দম নিতে একটু থামল। তারপর বারদুয়েক চোস্ত টান মারল চুরুটে।

প্রফেসার নিধিরাম পাটকেল যে এত নামকরা লোক সেটা ঝালা-পালা জানত না। এক পাড়ায় থাকেন বলেই হয়তো ওরা তেমন গুরুত্ব দেয়নি। ওদের খুব খারাপ লাগল।

ছোটকা আবার বলতে শুরু করল, 'তোরা হয়তো জানিস না, গত বছরে প্রফেসার রায়না হঠাৎ দশদিনের জন্য নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের গোপন তদন্ত বিভাগ তাঁকে বহু চেষ্টা করে খুঁজে পায়নি। অবশেষে প্রফেসার রায়না নিজে নিজেই একদিন ফিরে আসেন। কিন্তু আশ্চর্য, তিনি দশদিন কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন, এ-বিষয়ে একটি কথাও তাঁর কাছ থেকে আদায় করা যায়নি। হাজার তদন্ত করে আমরাও কিছু বের করতে পারিনি। প্রফেসারের কাজকর্ম এরপর থেকে ঠিকঠাক চললে কারো আর চিন্তার কিছু ছিল না। কিন্তু গোলমালটা বাধল ঐখানেই। মানুষটার গবেষণার বুদ্ধি আর নিত্যনতুন আবিষ্কারের মিছিল যেন তারপর থেকেই মুখ থুবড়ে পড়ল। ভারতের সামরিক বিভাগের জন্য বহু আবিষ্কার উপহার দিয়েছেন প্রফেসার রায়না। সুতরাং তাঁরাও চাপ দিতে লাগলেন গোপন তদন্ত বিভাগকে। কিন্তু ফল কিছু পাওয়া গেল না।'

'কেউ ওঁকে ইঞ্জেকশান দিয়ে পাগল বা বোকা করে দেয়নি তো, ছোটকা?' এক রাশ আগ্রহ নিয়ে সমাধান জোগাতে চাইল ইন্দ্রকান্ত।

ছোটকা বলল, 'হতে পারে। জানি না। কারণ ফিরে আসার পর থেকে প্রফেসার রায়না লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা একেবারে কমিয়ে দিয়েছেন। কেমন যেন খিটখিটেও হয়ে গেছেন। যাই হোক, এরপরে ঠিক একই ঘটনা ঘটল প্রফেসার শ্যামমূর্তির বেলায়। অবশ্য রায়নার মতো নিরুদ্দেশ তিনি হননি। কী একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে রাজস্থান গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসেই একেবারে অন্য মানুষ! নাঃ, এবারও আমরা রহস্য ভেদ করতে পারিনি। শুধু ধরে নিয়েছি খামখেয়ালি মানুষগুলোর বুদ্ধি হঠাৎ করেই অকেজো হয়ে গেছে।'

ছোটকার চুরুটটা নিবে এসেছিল। সেটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ছোটকা নতুন একটা ধরাল। তারপর বলল, 'এই দুটো ঘটনার পর গোপন তদন্ত বিভাগ বাকি যেসব নামীদামি বিজ্ঞানী আছেন তাঁদের একটা লিস্ট বানাল। তার প্রথম নাম প্রফেসার অজয় সেনশর্মার। তখন বড়সায়েব আমাকে ডেকে বললেন ওঁর ওপরে নজর রাখতে। তা আমি নজর রাখি, আর তোদের কাছ থেকেও মাঝে-মধ্যে আমি ওঁর খবরাখবর নিই। এতদিন তো কোনো গোলমাল হয়নি, আজই কেমন যেন একটু চিন্তা হচ্ছে।'

ছোটকার কপালে অনেকগুলো ভাঁজ পড়ল করোগেটেড টিনের চালার মতো। দেওয়ালের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'কাল সকালেই প্রফেসার সেনশর্মার খোঁজ করতে হবে। তোরা দুজনে গিয়ে খোঁজটা নিয়ে আসিস। আমি চাই না আমাকে ভদ্রলোক সন্দেহ করুন।'

ঝালা-পালা এককথায় রাজি। কিন্তু ছোটকার মুখে তদন্তের পুরো ব্যাপারটা শোনার পর ওদের কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল। সেটা ছোটকা বোধহয় কিছুটা আঁচ করল। কারণ খাট থেকে নেমে মানিকজোড় রওনা হতেই সে দুজনের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, 'ভয়ের কিছু নেই রে। আমি তো আছি!'

ঝালা-পালা ফিরে এল ওদের ঘরে। ওরা দু'জনে আলাদা একটা ঘরে শোয়—সঙ্গে শুধু থাকে ঝামেলা। ঝামেলার জন্য ঘরের একপাশে একটা ছোট্ট

বিছানা পাতা আছে। ঘর অন্ধকার ছিল। চন্দ্রকান্ত সুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঝামেলা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বিছানায় শুয়ে আছে। আর আপন মনে সেই বানানটা রপ্ত করে চলেছে।

দু-ভাই এ-ওর দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। শুতে না শুতেই ওরা শুনতে পেল, ঝামেলা বানান প্র্যাকটিস থামিয়ে বলছে, 'তোমাদের সব কথাই আমি এখান থেকে শুনিতে পাইয়াছি। কাল ইট-পাটকেলের বাড়ি যাবার সময় আমাকেও নিয়ে যেতে হবে কিন্তু। গুড নাইট।' তারপর শুরু হল ওর বানান প্র্যাকটিস, 'ত ম-এ আকার, ল—তমাল, তমাল...'

আগামীকাল ইট-পাটকেলের—মানে নিধিরাম পাটকেলের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে পাওয়া যাবে তো ? নাকি দেখা যাবে উনিও প্রফেসার রায়নার মতো রাতারাতি উধাও হয়ে গেছেন !

এসব ভাবতে ভাবতেই ঝালা-পালা ঘুমিয়ে পড়ল।

॥ চার ॥

প্রফেসার নিধিরাম পাটকেলের বাড়িটা ছবির মতন। ঝালা-পালাদের বাড়ির মতো এ-বাড়িতেও লাগোয়া বাগান আছে। দূর থেকেই বাগানের রঙিন ফুলগুলো চোখে পড়ল। তিন জন, কারণ, ঝামেলাও আছে ঝালা-পালার সঙ্গে। সেই কাকভোরে উঠেই ও 'তন্বীতমালতালিবনরাজিনীলা' বানান ও উচ্চারণ পাঁচ-পাঁচবার করে শুনিয়ে দিয়েছে দু-ভাইকে। তারপর তাড়া লাগিয়েছে রওনা হওয়ার জন্য।

এখন সবে ছটা কি সওয়া ছটা বাজে। এই সাতসকালে ওরকম একজন নামজাদা বিজ্ঞানীর বাড়িতে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করাটা কি ঠিক হবে ! অবশ্য যদি ইতিমধ্যেই তিনি উধাও না হয়ে গিয়ে থাকেন ! ঝালা-পালার বুকের ভেতরটায় কেমন গুড়গুড় করছে। দু-ভাই হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। আর একটু পিছনেই ঝামেলা। কিচির-মিচির করছে আর বলছে, 'অহো, প্রাতঃকালের কী শোভা ! ফুজিয়ামা ! ফুজিয়ামা !'

নাঃ, ওদের আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত হল। বাগানেই পাওয়া গেল প্রফেসার নিধিরামকে। নরম মাটির ওপরে বসে ঝুঁকে পড়ে কী যেন করছেন। ঝালা-পালা জানে, নিজের হাতেই উনি বাগানের পরিচর্যা করে থাকেন। তাছাড়া বাড়িতে ওঁর লোকজন বলতে একটিমাত্র কাজের লোক। রান্নাবান্না থেকে প্রফেসারের দেখাশোনা—সবই সে করে থাকে। আর আছে ইয়া এক বাঘা অ্যালসেশিয়ান কুকুর। কুচকুচে কালো তার গায়ের রঙ। সবুজ চোখদুটো সব সময় জ্বলছে। ঠিক যেন হাউণ্ড অব দি বাস্কারভিল্স ! কুকুরটার দৌলতে অচেনা কেউ বাড়ির আশেপাশে পর্যন্ত ঘেঁষতে পারে না। কুকুরটা প্রফেসারের কথা এমনভাবে মেনে চলে যে মনে হবে সে বুঝি মানুষের ভাষা বোঝে।

কুকুরটাকে দেখলেই ঝালা-পালা ভয় পায়, কিন্তু ঝামেলা একটুও ভয় পায় না। কারণ একদিন কুকুরটা ছুটে এসে ঝামেলার পায়ে কামড়ে দিয়েছিল। ঝামেলার তো স্টিলের পা ! সুতরাং ওর কিছু হয়নি। বরং 'কেঁউ' আওয়াজ তুলে অ্যালসেশিয়ানটা ছুটে পালিয়েছিল বাড়ির ভেতরে। তার একটা চোখা দাঁত ভেঙে পড়েছিল ঝামেলার পায়ের কাছে। তারপর থেকে ঝামেলাকে দেখলেই সাংঘাতিক কুকুরটা একটু ভয়ে ভয়ে থাকে।

কুকুরটাকে বাগানে দেখা গেল না। এমনকী ওরা তিনজনে বাগানে ঢোকার পরেও তার কোনো 'ঘেউ ঘেউ' শোনা গেল না।

প্রফেসার নিধিরাম ওদের দিকে পেছন

ফিরে বসে আছেন। তাঁর হাতে-পায়ে জামায় মাটি মাখামাখি। পাশেই পড়ে রয়েছে একটা কোদাল আর একটা বেলচা। উনি ঝুঁকে পড়ে দু-হাত বুলিয়ে বাগানের মাটির ওপরে হাত বোলাচ্ছেন। যেন এইমাত্র একটা গর্ত বুজিয়ে ফেললেন।

চন্দ্রকান্ত পিছন থেকে হঠাৎ বলে উঠল, 'বাপ রে কী ডানপিটে ছেলে! কোন্‌দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে।...বলুন তো, কোন্ ছড়া?'

যেন একটা বিপর্যয় ঘটে গেল মুহূর্তে। প্রফেসার নিধিরাম পাটকেল ক্যাঙারুর মতো এক ঝম্প লাফ মেরে ছিটকে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। একই সঙ্গে পিছন দিকে ঘুরে তাকাতে গিয়ে বে-তাল হয়ে উলটে পড়েন আর কি! তাঁর মুখ থেকে 'কে? কে?' বলে যে কান-ফাটানো চিৎকারটা বেরিয়ে এল সেটা কোনো মানুষের পক্ষে করা সম্ভব বলে ঝালা-পালার মনে হল না। প্রফেসারের বিকট ভঙ্গিতে আঁতকে ওঠা দেখে ঝালা-পালা আর ঝামেলা, তিনজনেই যেন পালটা আঁতকে উঠল। ঝামেলা চিঁ-চিঁ করে কীসব শব্দ করতে লাগল, ওর কপালের আলোগুলো জ্বলতে শুরু করল দপ্‌দপ্ করে। আর একই সঙ্গে তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাগল ও।

একটু পরেই প্রফেসার নিধিরাম নিজেকে সামলে নিলেন। মাটিমাখা হাত দুটো প্যান্টে ঘষে সাফ করতে চাইলেন। তারপর হোঁচট-খাওয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'এই সাতসক্কালে তোমরা কী মনে করে?'

চন্দ্রকান্ত হেসে বলল, 'যে ছড়াটা বললাম, বললেন না তো সেটার নাম কী?'

প্রফেসার নিধিরাম কিছুক্ষণ চিন্তা করার ভান করে বললেন, 'তোমার ছড়া তুমিই জানো। আমি কী করে তার নাম বলি!'

ঝালা-পালা দুজনেই অবাক হল প্রফেসারের কথায়। আবোল-তাবোলের 'ডানপিটে ছেলে' ছড়াটার নাম বলতে পারছেন না! নাকি মশকরা করছেন ওদের সঙ্গে?

ঝামেলা হঠাৎই মিহি সুরে জানতে চাইল, 'সারা গায়ে মাটি মেখে এই সাতসক্কালে আপনিই বা কোন্ রাজকার্যে নিম-নিম—নিমগ্ন ছিলেন? জানিতে পারি কি?'

প্রফেসার নিধিরাম বেশ কৌতূহলী নজরে ঝামেলাকে লক্ষ করছিলেন। একটু সময় নিয়ে বললেন, 'এই বাগানের একটু ভালমন্দ যত্ন করছিলাম।'

ঝালা ও পালা আড়চোখে কোদাল ও বেলচা দুটোর দিকে দেখছিল। দুটোরই গায়ে চাপ চাপ মাটি লেগে রয়েছে। একটু আগেই ও-দুটো দিয়ে কোনো গর্ত খুঁড়েছিলেন প্রফেসার। কিন্তু কেন?

ঝামেলা প্রফেসার নিধিরামের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ওর প্রকাণ্ড মাথাটা নড়ছিল এপাশ-ওপাশ। কেন জানি না মনে হচ্ছে প্রফেসারের উত্তর ঝামেলাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ঘুরপাক খেতে খেতেই ঝামেলা হঠাৎ গানের সুরে বলতে লাগল, 'ঘচাং-কু, খাব তোকে—ঘচাং-কু, খাব তোকে—'

এটা যে একটা সিনেমার গানের লাইন সেটা ঝালা-পালা জানে। কিন্তু ঝামেলা যে কাকে খেতে চাইছে তা ঠিক ওরা বুঝতে পারল না। তাছাড়া ওদের মনের কোণে একটা ভয় বাসা বাঁধছিল: প্রফেসারের কালো রঙের বাঘা অ্যালসেশিয়ানটা কোথায়? এমনিতে প্রফেসার নিধিরামকে বহাল তবিয়তে হাজির দেখে ঝালা-পালা একটু খুশিই হয়েছিল। গতকাল রাতে তাঁর জন্যে ছোটকা তো কম চিন্তায় পড়েনি! কিন্তু এখন সেই খুশি ও স্বস্তির সঙ্গে কোথায় যেন একটা অস্বস্তি ঢুকে বসে রয়েছে।

এদিকে প্রফেসার নিধিরাম ঝামেলাকে

নির্ঘাত পাগল ভাবছিলেন। তিনি কিছু একটা করে ওঠার আগেই চন্দ্রকান্ত ধমক দিল ঝামেলাকে, 'কী অসভ্যতা হচ্ছে! স্ট্যাচু!'

ঝামেলা স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। ঠিক তক্ষুনি প্রফেসার নিধিরাম ওদের দুজনের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কাল ঐ জঙ্গলে তোমরা একটা সবুজ পাথর কুড়িয়ে পেয়েছ?'

ঝালা-পালা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল ঐ প্রশ্ন শুনে। সবুজ পাথরের কথা প্রফেসার নিধিরাম পাটকেল জানলেন কেমন করে? ওরা যখন পাথরটা কুড়িয়ে ছুটে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছিল তখন তো নিধিরাম পাটকেলকে ওদের চোখে পড়েনি!

'সবুজ পাথরটা কোথায়?' নিধিরামের গলা খানিকটা কর্কশ হল। সূর্যের তেজ বেড়ে ওঠায় নিধিরাম পাটকেলের নেড়া মাথা বেশ চকচক করছে।

ঝালা-পালা একটু চুপ করে থেকে সমস্বরে বলে উঠল, 'আমাদের ছোটকার কাছে।'

নিধিরাম পাটকেলের মুখের রেখা নরম হল। মজা-মজা আজব ভাবটা ফিরে এল। ঝাঁটা-গোঁফে বার দুয়েক তা দিয়ে তিনি বললেন, 'আসলে কী ব্যাপার জানো, পাথরটা আমার। গাছের পাতা খুঁটিয়ে পরখ করার জন্যে ওটা আমি তৈরি করেছি। কাল ওটা আমার পকেট থেকে অসাবধানে পড়ে গেছে। তোমাদের ছোটকাকে বোলো পাথরটা যেন আজকের মধ্যেই আমাকে ফেরত দেয়।'

প্রফেসার নিধিরামের মিঠে-মিঠে কথাগুলোর মধ্যে যে একটা ভয় দেখানো ব্যঙ্গের সুর চাপা রয়েছে সেটা সহজেই বুঝতে পারল ঝালা-পালা। প্রফেসারের কথা শেষ হতেই ইন্দ্রকান্ত চেঁচিয়ে ঝামেলাকে বলল, 'ঝামেলা, স্ট্যাচু কাটাকুটি! এবারে বাড়ি চলো।'

ঝামেলা যেন প্রাণ ফিরে পেল। এবং প্রাণ ফিরে পেয়েই প্রফেসারকে বলল, 'আপনার কালো কুত্তাটি কোথায়? তাহাকে দেখিতে পাচ্ছি না!'

প্রশ্নটা শোনামাত্র প্রফেসার নিধিরামের মজারু মুখখানা ঝট করে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। আমতা-আমতা করে তিনি বলতে লাগলেন, 'হ্যাঁ, আছে—মানে, বাড়ির ভেতরেই আছে। সবসময়—ইয়ে—খুব গোলমাল করে কিনা, তাই ওকে—।'

ঝামেলা হাত তুলে তাঁকে থামতে বলল, 'থাক্, আর পরিশ্রম করিয়া গুল মারতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। চলো, বাড়ি চলো।'

শেষের কথাগুলো অবশ্যই ঝালা-পালাকে লক্ষ করে। অতএব ওরা তিনজনে রওনা হয়ে পড়ল। আর কিম্ভূতকিমাকার প্রফেসার অজয় সেনশর্মা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো রাগে অপমানে ধক্-ধক করে জ্বলছিল।

বাড়ি ফেরার পথে ঝালা-পালা ধমক দিল ঝামেলাকে, 'ছিঃ, ওঁর বাড়িতে তুমি কী অসভ্যতা শুরু করেছিলে? এইজন্যেই তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে নেই!'

ঝামেলা চটপট জবাব দিল, 'যমজ দাদাভাইরা, তোমরা কি বুঝতে পেরেছ ঐ ইটপাটকেল প্রফেসারটি একটি এক নম্বরের মিথ্যেবাদী? প্রথম কথা, সবুজ পাথরটা কাল ওঁর পকেটে ছিল না। যদি থাকতই, তাহলে তোমাদের 'আহ্লাদী' ছড়াটা শোনাবার সময়ে পাথরের আলট্রাসনিক শব্দ আমার কানে আসেনি কেন? আর দু-নম্বর মিথ্যে হল, কালো কুকুরটা প্রফেসারের বাড়িতে নেই। আমি যখনই ও-বাড়ির কাছাকাছি যাই তখনই কুকুরটার ফোঁস-ফোঁস, ফিস-ফাস, বা ঘেউ-ঘেউ আমার আলট্রাসনিক শুনতে পাওয়া কানে ধরা পড়েই। আজ সেরকম কিছুই শুনিতে পাইলাম না। এখন কহ যমজ ভাইগণ, কী

অন্যায় আমি করিয়াছি ?'

ঝালা-পালা চলতে চলতে পথে দাঁড়িয়ে পড়ল। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাচ্চা-রোবটটার দিকে। রোবটের বাচ্চা তখন নাকি গলায় বেসুরো গাইছে, 'ঘচাং-কু, খাব তোকে—ঘচাং-কু...'

॥ পাঁচ ॥

'প্রফেসার সেনশর্মার কুকুরটা কাল রাতে মারা গেছে।' ছোটকা আচমকাই ঘোষণা করল কথাগুলো।

ঝালা-পালার মুখ থেকে সকালের অভিযান-কাহিনী শোনার পর কয়েকটা চুরুটের শ্রাদ্ধ করে ও বারকয়েক 'হুম' শব্দ করে অফিসে বেরিয়ে পড়েছে ছোটকা। তারপর সারাটা দিন কোথায় কোথায় কাটিয়ে ফিরে এসেছে সন্ধের মুখে। এখন ছোটকা দু-ভাইকে নিয়ে আসর জমিয়েছে নিজের ঘরে। ঝামেলার উৎপাত থেকে রেহাই পেতে ইন্দ্রকান্ত ওকে 'পুণ্ডরীকাক্ষ' শব্দটা বানান করে উচ্চারণ করতে দিয়েছে। ঝামেলা সে-চেষ্টাই করে যাচ্ছে ছোটকার ঘরের এক কোণে হাঁটু গেড়ে বসে।

'প্রফেসারের বাড়ির কাজের লোকটিকে রাস্তায় ধরে জানতে পেরেছি কুকুর মারা যাওয়ার খবরটা।' ছোটকা বলল।

'তাহলে সকালবেলা প্রফেসার কি কুকুরটাকেই কবর দিচ্ছিলেন বাগানে ?' চন্দ্রকান্ত নিজের সন্দেহটা ছুঁড়ে দিল ছোটকার দিকে।

'নির্ঘাত তাই।' ছোটকা বেশ জোর দিয়ে বলল, 'কিন্তু একটা কথা ভেবে অবাক লাগছে, কুকুর কবর দেবার ব্যাপারটা অজয় সেনশর্মা তোদের কাছে চেপে গেলেন কেন। পোষা কুকুর মারা গেলে যে দুঃখ-টুঃখ পাওয়ার কথা তাও উনি পেয়েছেন বলে মনে হল না...।' ছোটকার কপালে একরাশ ভাঁজ পড়ল। ছোটকা বলে, যে যত বেশি বুদ্ধিমান তার কপালে ভাঁজও পড়ে তত বেশি।

ছোটকা অনেকটা আপনমনেই বিড়বিড় করে বলল, '...আর ঝামেলার কথাগুলোও উড়িয়ে দেবার নয়। সবুজ পাথরের গল্পটা বানানো...কুকুরের মারা যাবার ঘটনা চেপে যাওয়া...নাঃ, আজ রাতেই একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। ঐ নিধিরাম পাটকেলের ওপরে নজর রাখা দরকার...।'

চন্দ্র ও ইন্দ্র ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ল ভেতরে ভেতরে। যে করে হোক ছোটকাকে রাজি করাতে হবে ওদের সঙ্গে নেবার জন্য। কিন্তু মা-বাবা কি মত দেবে খুব সহজে ? মনের কথা আর চেপে না রেখে মুখে প্রকাশই করে ফেলল ওরা।

ছোটকা খুব চিন্তিত গলায় বলল, এ-তদন্তে বেশ বিপজ্জনক গন্ধ পাচ্ছি রে ! শেষকালে কি তোদের দুজনকে বিপদে ফেলব ?'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের অনুনয় ও আগ্রহভরা সুন্দর মুখদুটোর দিকে তাকিয়ে ছোটকা 'না' বলতে পারল না। ওরা মনের খুশিতে একেবারে জাপটে ধরল ছোটকাকে।

'তবে শুধু নজর রাখা ! তার বেশি কিছু নয় কিন্তু !' ওদের সাবধান করে দিয়ে বলল ছোটকা, 'রাত আটটায় আমরা বেরোব, কেমন ?'

চন্দ্রকান্ত তখন ঘরের কোণে দাঁড়ানো ঝামেলাকে লক্ষ করে বলল, 'ঝামেলা, এদিকে এসো। রাতে আমাদের সঙ্গে তুমিও যাবে, কেমন !'

ঝামেলা উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর চালে হেলে-দুলে ওদের কাছে এগিয়ে এল। তারপর একই ঢঙে বলল, 'মানুষের চেয়ে রোবট অনেক উন্-উন্নত। এসব কাজে রোবটকে বাদ দিয়ে যে চলতে পারে না তাহা জানিতে আমার বাকি নাই।'

ছোটকা হেসে ওকে বলল, 'খুব যে বড়

বড় কথা বলছ ! পুণ্ডরীকাক্ষ কথাটা তৈরি হয়েছে ?'

'তৈরি হয়নি আবার ! উহা অতি সহজ শব্দ।' একথা বলে ঝামেলা মিহি সুরে চিৎকার করে উচ্চারণ করল, 'পুণ্ডরীখ্যাঁক্কো !'

ছোটকা ও ঝালা-পালা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল একসঙ্গে।

॥ ছয় ॥

রাত ঠিক সাড়ে-আটটার সময়ে প্রফেসার নিধিরাম পাটকেল চুপি-চুপি বাড়ি থেকে বেরোলেন। ঝালা-পালা, ঝামেলা ও ছোটকা চারজনেরই চোখে পড়ল ব্যাপারটা। ঝালা-পালা গভীর শ্বাস টেনে বলল ফিসফিস করে, 'কোথায় যাচ্ছে, ছোটকা ?'

ছোটকা ওদের পাশটিতেই দাঁড়িয়ে ছিল। ঠোঁটে আঙুল তুলে বলল, 'শ্-শ্-শ্ ! কোথায় যাচ্ছে সেটা এক্ষুনি টের পাবি।'

'মানুষের ধৈর্য বড় কম !' চাপা মিহি গলায় মন্তব্য করল ঝামেলা।

চন্দ্রকান্ত ঝামেলার তেল চকচকে মাথায় একটা আদুরে চাঁটি বসিয়ে দিল। ছোটকা চাপা গলায় আবার সাবধান করল, 'কী হচ্ছে কী !'

প্রফেসার নিধিরাম পাটকেল তখন এপাশ-ওপাশ দেখে মাঠের দিকে রওনা হয়েছেন। এদিকটায় এমনিতেই লোকবসতি কম, তার ওপর রাত সাড়ে-আটটা, ফলে সব নির্জন, নিঝুম। শুধু দু-একটা বাড়ির জানলা দিয়ে ছিটকে আসা আলো গড়িয়ে পড়েছে পিচের রাস্তায়।

প্রফেসারের বাড়ির কাছ থেকে অন্তত পঞ্চাশ হাত দূরে ওরা চারজন শ্যেনদৃষ্টি মেলে মোতায়েন ছিল। না, প্রফেসারের ওপর নজর রাখার কোনো অসুবিধে তাতে হয়নি। কারণ, পঞ্চাশ হাত দূর থেকেও ঝামেলা সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল।

অন্ধকারে মাঠের পথে চলতে চলতে প্রফেসার যখন আরও অন্ধকারে মিশে গেলেন তখন ছোটকা অনুসরণ করার উদ্যোগ করতেই ঝামেলা ছোটকার প্যান্ট ধরে টান মারল। বলল, 'তাড়াহুড়োর দরকার নেই। আমি পষ্ট ওঁকে দেখতে পাচ্ছি। জঙ্গলের দিকেই উনি যাচ্ছেন। আগে জঙ্গলে ঢুকে পড়ুন, তারপর আমরা ইটপাটকেল মহাশয়কে অনুসরণ করিব। তাহাই জুতসই হইবে না কি ?'

চন্দ্রকান্ত হেসে বলল, 'ঠিকই বলিয়াছ, উহাই জুতসই হইবে।'

ইন্দ্র ও ছোটকা মুখ টিপে হাসল। তারপর আরও মিনিট চার-পাঁচ অপেক্ষা করে ওরা প্রফেসারকে অনুসরণ করল। ঝামেলা তাঁকে দেখতেও পাচ্ছিল আর তাঁর পায়ের শব্দও শুনতে পাচ্ছিল।

অন্ধকারে ভিজে ঘাস মাড়িয়ে ওরা চলেছে। শরীর ভারী হওয়ায় ঝামেলার পা বসে যাচ্ছে নরম মাটিতে। ও বড় বেশি পিছিয়ে পড়ছে দেখে ঝালা-পালা বারবার ওকে তাড়া মারতে লাগল।

চলতে চলতে হঠাৎই ঝামেলা চিৎকার করে উঠল, 'সবুজ পাথর ! সবুজ পাথর ! প্রফেসার ইটপাটকেলের হাতে একটা সবুজ পাথর !'

ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গে ছোটকা বলে উঠল, 'তোরা আর এগোস না ! আমি দেখছি !' তারপর ব্লাস্টারটা জামার ভেতর থেকে বার করে তীরবেগে ছুটতে শুরু করল জঙ্গল লক্ষ করে। ওদের সামনে থেকে পলক পড়তে না পড়তেই মিলিয়ে গেল ছোটকার ছুটন্ত শরীরটা।

একটু পরে ঝালা-পালা আর ঝামেলাও মরিয়া হয়ে ছুটতে শুরু করল সেদিকে। প্রফেসার সেনশর্মা তখন জঙ্গলের বেশ কিছুটা ভেতরে ঢুকে পড়েছেন। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু প্রফেসারের হাতে

ধরা সবুজ একটা পাথর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে—ঠিক যেরকম পাথর গতকাল ঝালা-পালা ও ঝামেলা কুড়িয়ে পেয়েছিল। পাথর থেকে বেরিয়ে আসা লালচে আভায় প্রফেসারের মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে। ঠিক সেই মুহূর্তে জঙ্গলের মাটিতে একটা কাঁপুনি শুরু হল—যেন হালকা ভূমিকম্প হচ্ছে। তারপরই জঙ্গলের বিশাল-বিশাল কতকগুলো গাছ সরে যেতে লাগল দু-পাশে। মাটি ফাঁক হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সেই ফাঁক দিয়ে ছিটকে আসছে সবুজ আলোর আভা।

ছুটন্ত অবস্থাতেই ছোটকা প্রফেসারের কীর্তিকলাপ সব দেখতে পেয়েছিল। তাই চিৎকার করে বলল, 'খবর্দার! নড়াচড়া করলেই ব্লাস্টার দিয়ে উড়িয়ে দেব!'

কিন্তু প্রফেসার সেনশর্মা সে-কথায় কোনোরকম আমল না দিয়ে এগিয়ে চললেন ফাঁক-হয়ে-যাওয়া মাটির দিকে। দেখা গেল, সেই ফাঁক দিয়ে ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে নীচে। নীচে সবুজ আলোর ছটা।

প্রফেসার একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন পিছনে। ছোটকা তখনও অনেকটা দূরে। তিনি হয়তো ভাবলেন ছোটকা তাঁকে ধরার আগেই তিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে পারবেন গর্তের ভেতরে। তাই ছুটলেন গর্ত লক্ষ করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে ছোটকা ব্লাস্টার উঁচিয়ে ফায়ার করল। না, কোনো শব্দ হল না। কোনো আগুনের ঝলকও দেখা গেল না। শুধু প্রফেসার নিধিরামের বাঁ দিকে দাঁড়ানো একটা বিশাল ঝুপসি বটগাছ মিলিয়ে গেল হাওয়ায়। শুধু পড়ে রইল তার পোড়া কিছু খাপছাড়া টুকরো। যে চাঁদের আলো এতক্ষণ আড়াল হয়ে ছিল তা এসে পড়ল জঙ্গলের ঘাসে, লতায় পাতায়, প্রফেসারের গায়ে।

ছোটকা গর্জন করে উঠল, 'এখনও বলছি, সাবধান!' এবং পরক্ষণেই ব্লাস্টার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হতভম্ব প্রফেসার নিধিরামের ওপরে। প্রফেসার একটা চিৎকার করে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলেন ছোটকার সঙ্গে। সবুজ পাথরটা তাঁর হাত থেকে তখন ছিটকে পড়েছে মাটিতে।

ঠিক সেই সময়ে ঝালা-পালা ও ঝামেলা হাজির হল ঘটনাস্থলে। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে খুদে খুদে দুই বীরপুরুষ ছোটকার সাহায্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্রফেসারের ওপরে। চলতে লাগল চারটে শরীরের জটলা। ব্যাপার দেখে ঝামেলা এগিয়ে এল। চারটে মাথার মধ্যে নেড়া মাথাটি বেছে নিয়ে ওর লোহার ডান হাতটা সজোরে বসিয়ে দিল ব্রহ্মতালুতে। পলকে সব ঝটাপটি শেষ। হাঁফাতে-হাঁফাতে ছোটকা আর ঝালা-পালা উঠে দাঁড়াল। অদূরে ছিটকে পড়া ব্লাস্টারটা কুড়িয়ে নিল ছোটকা। প্রফেসার নিধিরাম অসাড় হয়ে পড়ে আছেন মাটিতে।

ঝালা-পালা বলল,'থ্যাংক য়ু, ঝামেলা।'

ছোটকা সবুজ পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে ঢোকাল। তারপর ঝুঁকে পড়ে প্রফেসারের নাকের কাছে হাত রাখল। না, নিশ্বাস পড়ছে।

এমন সময় ঝামেলা মিহিসুরে চিৎকার করে উঠল, 'জলদি! গর্তটা আবার বুজিয়া যাইতেছে!'

চট করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সেদিকে নজর করল ছোটকা। তারপর 'কুইক!' বলে ছুটল সেদিকে। ঝালা-পালাও ছুটল কোনোরকম দেরি না করে।

অতি সহজেই ওরা ঢুকে পড়ল ভেতরে। ঝামেলা পিছিয়ে পড়েছিল। ছোটকা হাত বাড়িয়ে ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই অদ্ভুত ঘড়ঘড় শব্দ তুলে গর্তের মুখটা বন্ধ হয়ে গেল।

ভেতরটা হালকা সবুজ আলোয় ঝকঝক করছে। দশ-বারোটা সিঁড়ি নামলেই একটা

বিশাল ঘর। ঘরে বেশ কিছু অজানা-অচেনা যন্ত্রপাতি। দু-তিনজন মানুষও চলাফেরা করছে ব্যস্তভাবে। ছোটকা ওদের তিনজনকে দাঁড়াতে বলে পকেট থেকে দেশলাই-বাক্সের মাপে কী একটা জিনিস বের করল। তারপর সেটার গায়ে একটা ছোট বোতাম টিপে বাক্সটা রেখে দিল সিঁড়ির ধাপের এককোণে। ঝালা-পালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এই ট্রান্সমিটারটা দিয়ে আমাদের গোপন তদন্ত বিভাগে খবর চলে যাবে আমরা কোথায় আছি। দশ মিনিটের মধ্যে সিকিওরিটি ফোর্স চলে আসবে এখানে। কিন্তু এখানে কী কাণ্ড হচ্ছে বল দেখি!'

ওরা চারজনে সতর্ক পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ঘরের মেঝেতে এসে দাঁড়াল। ব্লাস্টার উঁচিয়ে ছোটকা সবার আগে। ঘরে যে কজন লোক ব্যস্ত ছিল তারা হঠাৎই ওদের খেয়াল করল। তাদের প্রত্যেকের পরনে ধবধবে সাদা ফুলশার্ট ও ফুলপ্যান্ট। মাথায় সাদা টুপি। আর সবচেয়ে অবাক কাণ্ড হল, লোকগুলো দেখতে হুবহু একরকম। ছোটকা চাপা গলায় বলল, 'ঝালা-পালা, এখানে সবাই দেখছি তোদের মতো যমজ ভাই!' তারপর গম্ভীর স্বরে আদেশ করল ছোটকা, 'যে যেখানে আছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়ো! নইলে হাওয়া-বন্দুক দিয়ে হাওয়া করে দেব!'

মোট তিনজন লোক ছিল ঘরে। তারা চটপট দাঁড়িয়ে পড়ল পাথরের মূর্তির মতো।

ঝালা-পালার তো বুক দুরদুর করছে। ছোটকা একা সবাইকে সামলাতে পারবে তো! ঝামেলার মুখ থেকে আজগুবি নানান কিচিরমিচির শব্দ বেরোচ্ছে।

ছোটকা কী একটা বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় ঘরের দেওয়ালের গায়ে একটা ছোট দরজা খুলে একটি লোক ঘরে ঢুকল। তাকে দেখেই ছোটকা অবাক হয়ে চিৎকার করে উঠল, 'প্রফেসার রায়না!'

ততক্ষণে দাড়িওয়ালা দ্বিতীয় একজন ঢুকে পড়েছে ঘরের ভিতরে। তাকে দেখে ছোটকা আরও অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ কী! প্রফেসার শ্যামমূর্তি!'

ঝালা-পালার মাথায় কিছু ঢুকছে না। এই বিজ্ঞানী দুজন এই পাতালপুরীতে এলেন কেমন করে? ঝামেলা তখন ফিসফিস করে বলছে, 'এসব কী হচ্ছে? আমার নেড়া মস্তকে কিছুই ঢুকিতেছে না।' আর নিজের তেলা মাথায় হাত বোলাচ্ছে।

প্রফেসার রায়না ও প্রফেসার শ্যামমূর্তি হাসিমুখে ছোটকার কাছে এগিয়ে এলেন। অন্য তিনজন যেমন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল তেমনি দাঁড়িয়েই রইল।

প্রফেসার রায়না বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই সিক্রেট ইনভেস্টিগেশান ডিপার্টমেন্টের লোক। তা আমাদের দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছেন, তাই না?'

ছোটকার মুখে কোনো কথা ফুটল না। শুধু ব্লাস্টার বাগিয়ে ধরে সতর্ক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

এবারে প্রফেসার শ্যামমূর্তি হেসে বললেন, 'ভয়ের কোনো কারণ নেই। ব্লাস্টারটা আপনি নামিয়ে রাখতে পারেন। জানাজানি যখন হয়েই গেছে তখন সব খুলে বলছি। আমাদের সঙ্গে আসুন।'

রায়না ও শ্যামমূর্তি যে দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলেন সেই দরজার দিকে এগিয়ে চললেন নিশ্চিন্ত পায়ে। কোনো ভয় নেই, আশঙ্কা নেই, উত্তেজনা নেই। ঝালা-পালার যেন সব কিছু গুলিয়ে যাচ্ছে। ঝামেলাও নিশ্চুপ।

ছোট দরজাটা পেরোতেই একটা ছোট ঘর। এখানেও হালকা সবুজ আলো। প্রফেসার রায়না ছোটকার দিকে ফিরে বললেন, 'এবারে আপনি আরও অবাক হবেন। দেখুন, সামনে কে বসে আছেন!'

কথাটা বলে রায়না সরে দাঁড়াতেই ওরা

অবাক হয়ে দেখল ওদের সামনে বসে আছেন আদি ও অকৃত্রিম প্রফেসার অজয়েন্দ্র সেনশর্মা—নিধিরাম পাটকেল ! ঝাঁটা-গোঁফ চুমরে তিনি হাসছিলেন। ঝালা-পালাকে ছোটকার পিছনে দেখতে পেয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'বাপ্ রে কি ডানপিটে ছেলে ! কোন্ দিন ফাঁসি যাবে নয় যাবে জেলে।··· বলো দেখি, কোন্ ছড়া ?'

ঝালা-পালা এতক্ষণে নির্ভয়ে হাসতে পারল। দুজনে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আবোল তাবোলের ডান্‌পিটে !'

'শাবাশ ! এই নাও টফি।' বলে প্রফেসার নিধিরাম পকেট থেকে দুটো টফি বের করে এগিয়ে দিলেন চন্দ্র ও ইন্দ্রকে।

ওরা টফি নিয়ে অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু আজ সকালেই আপনি এটা কোন্ ছড়া তা বলতে পারেননি !'

ঝামেলা নিজের লোহার হাতটা একবার দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি যে ওপরের জঙ্গলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন—এখানে নেমে এলেন কেমন করে ?'

প্রশ্নের উত্তরটা শোনা গেল ওদের পিছন থেকে, 'অজ্ঞান উনি হননি, হয়েছিলাম আমি। আর ছড়ার নাম না বলতে পারাটাও আমারই দোষ।'

ছোটকা ঝালা-পালা ঝামেলা চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখে আর একজন প্রফেসার নিধিরাম পাটকেল সেখানে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে। তাঁর সঙ্গে রয়েছে বেশ কয়েকজন অচেনা মানুষ। তাদের প্রত্যেকের হাতেই ব্লাস্টার গান।

ছোটকা প্রথমে ভীষণ অবাক হয়ে গেল, তারপর এগিয়ে গেল ব্লাস্টার হাতে একজন প্রৌঢ় মানুষের দিকে। বলল, 'স্যার, আপনিও এসেছেন ?'

ঝালা-পালা বুঝল, ইনি নির্ঘাত ছোটকার বড়সাহেব।

বড়সাহেব তখন দরাজ হেসে বললেন, 'এত বড় একটা অপারেশান, নিজে না এসে পারি ?'

'কিন্তু স্যার, আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না !' ছোটকা দিশেহারা হয়ে বলল।

'প্রথমটা আমারও ঢোকেনি।' বড়সাহেব বললেন, 'কিন্তু ওঁকে গ্রেপ্তার করামাত্রই সব জানতে পারলাম। এ যেন রূপকথাকেও হার মানায় !'

বড়সাহেব দু-নম্বর প্রফেসার নিধিরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন। বড়সাহেবের কথা শেষ হতে না হতেই দু-নম্বর নিধিরাম দু-হাত ঘাড়ের কাছে নিয়ে মাথা নিচু করে অনেক কসরত করে একটা মুখোস ছাড়িয়ে নিল মুখ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে তাজ্জব কাণ্ড !

কোথায় গেল প্রফেসার নিধিরামের চেহারা ! কোথায় গেল তাঁর ঝাঁটা গোঁফ, কিংবা ঝুটো গোঁফ। যে মানুষটা এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে ওদের সামনে তাকে দেখতে অবিকল সাদা পোশাকপরা তিনজন লোকের মতো। অর্থাৎ, ওরা চারজন যেন একে অপরের ছবি !

ঝালা-পালা আর ছোটকার মুখের অবস্থা দেখে প্রফেসর রায়না হেসে বললেন, 'আসুন, সবাই মিলে আগে আয়েস করে বসা যাক। তারপর সব আমি বুঝিয়ে বলছি।'

ছোট ঘরটাতে সকলে এদিক-ওদিক জায়গা খুঁজে বসে পড়ল। শুধু ব্লাস্টার-হাতে তিনজন লোক দাঁড়িয়ে রইল ঘরের দরজার কাছে। ঝালা-পালা গুটিসুটি মেরে ছোটকার গা ঘেঁষে। আর ঝামেলা তখন আসল প্রফেসার নিধিরামের গা টিপে টিপে পরখ করছে। বাচ্চা রোবটটার কৌতূহল বড় বেশি !

প্রফেসার রায়না হুবহু একরকম দেখতে চারজন মানুষকে দেখিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধুগণ, এই চারজন হলেন প্ল্যানেট এক্স-এর বাসিন্দা। পৃথিবী থেকে বিশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে প্ল্যানেট এক্স। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এক্স

গ্রহটির চেহারা-চরিত্র অবিকল আমাদের পৃথিবীর মতো। গাছপালা, প্রাণী, এমনকী মানুষের মতো বাসিন্দাও রয়েছে সেখানে। ঠিক এই চারজনের মতো। কিন্তু প্রশ্ন হল, এক্স গ্রহের মানুষ পৃথিবীতে কেমন করে এল, কেন এল! প্রথমে বলে নিই, মহাকাশ-অভিযানের ব্যাপারে এক্স গ্রহ অনেক অনেক এগিয়ে গেছে আমাদের তুলনায়। অসীম মহাকাশের প্রায় কোনো জায়গাই ওদের কাছে আর দূর নয়। ফলে আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছনোটা ওদের কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা—'

বড়সাহেব বাধা দিয়ে বললেন, 'গত কয়েক বছরে পৃথিবীতে—বিশেষ করে ভারতে—যে উড়ন্ত চাকির ঘন-ঘন দেখা পাওয়া গেছে—'

'হ্যাঁ, তার জন্য আমরাই দায়ী—' প্ল্যানেট এক্স-এর বাসিন্দা দু-নম্বর নিধিরাম জবাব দিল।

''এক্স গ্রহের একটা বিরাট সমস্যা ছিল—' প্রফেসার রায়না আবার বলতে শুরু করলেন, 'মহাকাশ-অভিযানে পটু হওয়া ছাড়া আবিষ্কারের অন্যান্য দিকগুলোতে কোনো উন্নতিই করতে পারেনি ওরা। যেমন, যানবাহন, খাদ্যশস্য, কলকারখানা, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস—সব বলতে গেলে অনেক বড় লিস্ট হয়ে যাবে। সুতরাং নিজেদের উন্নতি আর অগ্রগতির জন্য এক্স গ্রহের মানুষরা মহাকাশযানে চড়ে সারা মহাকাশ তন্ন-তন্ন করে খুঁজে চলল, যদি কোথাও কোনোরকমে সাহায্যের হদিস পাওয়া যায়। এইভাবে খুঁজতে খুঁজতে একদিন ওরা আমাদের পৃথিবীগ্রহকে খুঁজে পেল। অবাক হয়ে প্ল্যানেট এক্স-এর প্রাণীরা দেখল, আমাদের সঙ্গে ওদের কত মিল! তক্ষুনি ওরা ঠিক করল, অগ্রগতির ব্যাপারে সাহায্য আদায় করতে হবে পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকেই...'

প্রফেসার শ্যামমূর্তি হেসে উঠে দাঁড়ালেন। কালো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'বাকিটুকু আমিই বলি, প্রফেসার রায়না।' একটু থেমে শ্যামমূর্তি সবার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন, 'এক্স গ্রহের মানুষরা ঠিক করল তারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের চুরি করে নিয়ে যাবে তাদের গ্রহে। সুতরাং তারা বিভিন্ন দেশে মাটির তলায় ঘাঁটি তৈরি করল। বছরের পর বছর ধরে লক্ষ করল পৃথিবীর মানুষের আচার-ব্যবহার। তাদের ভাষা শিখল, আদব-কায়দা শিখল। তারপর ছদ্মবেশে মাঝে-মাঝে মিশতেও লাগল মানুষের সঙ্গে। তারপর যেদিন তারা বুঝল সময় হয়েছে, তারা কিডন্যাপ করল প্রফেসার রায়নাকে। উদ্দেশ্য তাঁকে জোর করে প্ল্যানেট এক্স-এ নিয়ে যাওয়া, নতুন-নতুন গবেষণা ও আবিষ্কার করতে বাধ্য করা।

প্রফেসার রায়না ওদের বোঝালেন, তিনি উধাও হয়ে গেলে গোটা ভারতবর্ষের টনক নড়ে যাবে। সারা দেশে তোলপাড় শুরু হবে, হয়তো প্ল্যানেট এক্স-এর মানুষদের কয়েকটা ঘাঁটির সন্ধানও তারা বের করে ফেলবে। তখন সেই বিপদ ঠেকাতে ওদের একজন প্রফেসার রায়না সেজে চলে গেল তাঁর ভূমিকায় অভিনয় করতে। অভিনয় সে ঠিকই করল—এই মুহূর্তেও হয়তো দু-নম্বর রায়না সেজে সে চলাফেরা করছে বাঙ্গালোরে—কিন্তু গবেষণা বা আবিষ্কারের বিন্দুবিসর্গও সে জানে না। ফলে দেশের মানুষ অবাক হয়ে ভাবল রাতারাতি প্রফেসার রায়নার বুদ্ধি ভোঁতা হয়ে গেছে। এরপর একই ঘটনা ঘটল আমার বেলায় এবং প্রফেসার সেনশর্মার বেলায়...'

ছোটকার কাছে ক্রমশ ব্যাপারটা পরিষ্কার হচ্ছিল। পকেট থেকে সবুজ পাথরটা বের করে সে প্রফেসার শ্যামমূর্তিকে শুধোল, 'এটা দিয়ে কী কাজ করত ওরা?'



শ্যামমূর্তি বললেন, 'এক ঘাঁটি থেকে আর এক ঘাঁটিতে যোগাযোগ রাখত এই অদ্ভুত ধরনের রেডিও-আলট্রাসনিক ট্রান্সমিটার দিয়ে। এরকম ট্রান্সমিটার আগামী দুশো বছরেও আমরা তৈরি করতে পারব কি না সন্দেহ আছে। যাই হোক, এটা দিয়ে ছদ্মবেশী বিজ্ঞানীরাও ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত, ঘাঁটির দরজা খোলা-বন্ধ করার সংকেত পাঠাত।'

ছোটকার বড়সাহেব ভারী গলায় কাসলেন, 'এবারে দু-নম্বর প্রফেসার সেনশর্মার কথাগুলো শোনা যাক।'

তখন প্ল্যানেট এক্স-এর চারটি প্রাণীর একজন মুখ খুলল, 'প্রফেসার সেনশর্মাকে গতকাল যখন আমরা জঙ্গল থেকে ধরে আনি তখন আমার পকেট থেকে একটা ট্রান্সমিটার পড়ে যায়। সেটা কুড়িয়ে পায় ঐ যমজ ছেলে দুজন—'

ঝামেলা সঙ্গে সঙ্গে সরু গলায় ফোড়ন কাটল, 'ওরা নয়, আমি পাইয়াছিলাম।'

নকল নিধিরাম সে-কথা যেন শুনতেই পেল না। সে বলে চলল, 'তারপর প্রফেসার সেনশর্মার কুকুরটাকে আমি মেরে ফেলতে বাধ্য হই। কাজের লোকটা আমাকে নকল বলে চিনতে না পারলেও কুকুরটার নজরকে আমি ফাঁকি দিতে পারিনি। সেটাকে যখন বাগানে কবর দিচ্ছি তখন ঐ ছেলেদুটো আমাকে দেখতে পায়—'

'আমিও ছিলাম! তৎসহ আমিও ছিলাম!' ঝামেলা লাফাতে লাফাতে দু-পা এগিয়ে এল সামনে।

নকল নিধিরাম তখন বলছে, 'আচমকা ওদের ছড়া শুনে আমি চমকে উঠেছিলাম। বিশেষ করে জেল আর ফাঁসি শব্দ দুটো শুনে। তাছাড়া সুকুমার রায়ের আবোল

তাবোল তো আমার মুখস্থ ছিল না ! আর কুকুরটাকে মেরে ফেলার জন্য আমি সত্যিই আন্তরিক দুঃখিত।' তারপর প্রফেসার সেনশর্মার দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'আশা করি আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, প্রফেস্যার।'

প্রফেসার নিধিরাম হাসলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

বড়সাহেব চারপাশে নজর বুলিয়ে ব্লাস্টারটা বাঁ হাতের তালুতে বার কয়েক ঠুকলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'আর কী, এবারে সবাইকে গ্রেপ্তার করা হোক। এখুনি বাঙ্গালোর আর বম্বেতে ওয়ারলেসে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি। নকল রায়না আর নকল শ্যামমূর্তিকে গ্রেপ্তার করে যেন হেড অফিসে চালান দেওয়া হয়।'

ছোটকা আর ঝালা–পালাও ঘাড় নেড়ে সে-কথায় সায় দিচ্ছিল, কিন্তু ওরা অবাক হয়ে গেল প্রফেসার রায়নার কথা শুনে। তিনি বড়সাহেবকে বললেন, 'তার বোধহয় আর দরকার পড়বে না।'

সবার চোখেই প্রশ্ন ফুটে উঠল। প্ল্যানেট এক্স-এর চার বাসিন্দা সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রফেসার রায়না বললেন, 'প্রথমত কিডন্যাপ করার সময়টুকু ছাড়া এরা আমাদের বেশ রাজার হালেই রেখেছে। গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত কাটেনি। তাছাড়া, বহুদিনের চেষ্টায় আজই আমি ওদের রাজি করাতে পেরেছি আমার প্রস্তাবে। ওদের বুঝিয়ে বলেছি, জোর-জবরদস্তি করে বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আবিষ্কার আদায় করা যায় না। তার চেয়ে বরং সরকারি চুক্তি করে বিজ্ঞানী ধার করা ভাল। আমরা প্ল্যানেট এক্স-এ গিয়ে ওদের শিখিয়ে দেব আমাদের নানান প্রযুক্তিবিদ্যা। আর বিনিময়ে ওরাও এখানে থেকে পৃথিবীর মানুষদের উপহার দেবে ওদের আধুনিক মহাকাশ-গবেষণা, মহাকাশ-অভিযানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির কলাকৌশল। ওরা আমার প্রস্তাব মেনে নিয়ে ওদের সমস্ত ঘাঁটিতে সে-কথা জানিয়ে দিয়েছে। সুখের কথা, তারাও রাজি হয়েছে।'

ছোটকা বলল, 'এত সহজে রাজি হয়ে গেল ?'

উত্তরটা দিল নকল নিধিরাম, 'রাজি না হয়ে উপায় কী ! এতদিনে আমরা প্রফেসার রায়নার কাছ থেকে একটিও আবিষ্কার আদায় করতে পারিনি।' একটু হেসে সে বলল, 'এই বরং ভাল হল। প্ল্যানেট এক্স-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব হল প্ল্যানেট আর্থ-এর। আশা করি এ-বন্ধুত্ব চিরকাল অটুট থাকবে !'

তারপর সে বড়সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চিফ, এ-বন্ধুত্বে আপনার কোনো আপত্তি নেই তো ? নাকি আমাদের গ্রেপ্তার করবেন ?'

বড়সাহেব ভরাট হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই গ্রেপ্তার করব, তবে বন্ধুত্বের হাতকড়া দিয়ে।' বলে তিনি হ্যাণ্ডশেক করলেন নকল নিধিরামের সঙ্গে।

তারপরই শুরু হয়ে গেল মিলন-উৎসব। সবকটা মানুষ একসঙ্গে খুশিতে মেতে উঠল। কেউ-কেউ গান ধরল হেঁড়ে গলায়। প্রফেসার নিধিরাম গলা ফাটিয়ে গোটা আবোল তাবোলটাই আবৃত্তি করতে শুরু করলেন। ছোটকা ঝালা-পালাকে কোলে তুলে নিয়ে হৈ-হৈ করে নাচতে লাগল।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে ঝামেলাও তিড়িং-বিড়িং করে লাফাতে শুরু করল। ওর কপালের লাল-নীল-হলদে আলোগুলো দপ্-দপ্ করে জ্বলছে নিবছে। আর একই সঙ্গে বাচ্চা-রোবটটা ওর মিহি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছে, 'ফুজিয়ামা ! ফুজিয়ামা !'

ছবি : দেবাশিস দেব

Writer Anish Deb Passes Away: পেরিয়ে গেলেন 'বিজ্ঞানের দশদিগন্ত', করোনায় প্রয়াত সাহিত্যিক অনীশ দেব!



#কলকাতা: দিনকয়েক আগে শঙ্খ ঘোষ (Shankha Ghosh), সেই চলে যাওয়ার শোক কাটিয়ে ওঠার আগে ফের শোকের ছায়া বাংলার সাহিত্য জগতে। প্রয়াত সাহিত্যিক অনীশ দেব (Anish Deb)। করোনায় (Corona) আক্রান্ত হয়েছিলেন অনীশ বাবু। বুধবার সকাল ৭.১৮ মিনিটে মৃত্যু হয় তাঁর। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর। করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর থেকেই শারীরিক অবস্থার অবনতি হচ্ছিল তাঁর। ভর্তি ছিলেন কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। ভেন্টিলেশনে রাখতে হয়েছিল তাঁকে। দরকার পড়েছিল প্লাজমা ডোনারের। কিন্তু কোনও কিছুতেই আর লাভ হল না। চিরবিদায় নিলেন অনীশ দেব।

তাঁর মৃত্যুতে বাংলা সাহিত্যে শেষ হয়ে গেল একটা অধ্যায়।
কল্পবিজ্ঞানের জগতে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বড় নাম ছিলেন অদ্রীশ বর্ধন ও অনীশ দেব। অদ্রীশ গত বছরই মারা গিয়েছিলেন। এদিন প্রয়াত হলেন অনীশ দেবও। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া বাংলার সাহিত্য মহলে।

অনীশ দেবের জন্ম ১৯৫১ সালে কলকাতায়। অনীশ দেবের লেখালেখির শুরু মাত্র সতেরো বছর বয়সে। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯৬৮-তে অধুনালুপ্ত মাসিক 'রহস্য' পত্রিকায়। তারপর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন নামজাদা বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর লেখার প্রধান বিষয় - গোয়েন্দা-রহস্য, থ্রিলার, ভৌতিক-অলৌকিক এবং কল্পবিজ্ঞান। গল্পের বই ছাড়াও তিনি বাংলায় কয়েকটি কিশোরপাঠ্য বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থও রচনা করেছেন। পাশাপাশি ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যার উপর লেখা তার কিছু ইংরেজি বইও রয়েছে। এছাড়া তিনি বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থ সম্পাদনার কাজেও নিযুক্ত ছিলেন তিনি। কিছুকাল সম্পাদনা করেছেন কিশোর বিস্ময় পত্রিকা।

অনীশবাবুর পরিবার সূত্রে খবর, বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন প্রবীণ লেখক। কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর করোনা ধরা পড়ে। ক্রমশ শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটলে অনীশবাবুকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বুধবার সকালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ২০১৯ সালে কিশোর সাহিত্যে অবদানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 'বিদ্যাসাগর পুরস্কারে' সম্মানিত করে অনীশ দেবকে। এছাড়াও পেয়েছেন প্রাচীন কলাকেন্দ্র সাহিত্য পুরস্কার ও ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ পুরস্কারের মতো সম্মানও।